

# গৌতম বুদ্ধ

শ্রীআনন্দ

# গৌতম বুদ্ধ

শ্রীআনন্দ



মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

গৌতম বুদ্ধ  
লেখক  
শ্রীআনন্দ

© প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ  
পুনঃ মুদ্রণ : ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক :

শ্রী ডি. এল. এস. জয়বর্ধন।  
মহাবোধি বুক এজেন্সী।  
৪-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট।  
কলকাতা-৭০০ ০৭৩।  
ফো :- ২২৪১৯৩৬৩  
মো :- ৯৮৩১০৭৭৩৬৮

মুদ্রাকর :

শ্রীপঞ্চানন জানা  
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন  
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,  
কোলকাতা-৭০০ ০১২

মূল্য : ১০০/-

GAUTAMA BUDDHA  
BY  
SRI ANANDA

© Publisher

First, Published :-

1363 (Bangabda)

Reprint :- 2008 (Krishtabda)

**Publisher :**

SRI D. L. S. JAYAWARDANA  
Maha Bodhi Book Agency  
4-A, Bankim Chatterjee Street,  
Kolkata-700073  
Ph : 22419363  
M : 9831077368

**Printer :**

Panchanan Jana  
Jana Printing Concern  
40/1B, Sri Gopal Mollick Lane  
Kolkata-700012

Rs.—100/-

ISBN 10 : 81-87032-83-9

ISBN 13 : 978-81-87032-83-0

# উপক্রমণিকা

## রিপুরাজ্য

ধূ ধূ অনন্ত বিস্তীর্ণ নীল আকাশের তলে ধূ ধূ অনন্তবিস্তৃত নীল মহাসাগর, যতদূর দেখা যায় কেবল নীলে নীলে মেশামেশি।

বহুদূরে যেখানে নীল আকাশ ক্রমশ বাঁকা হইয়া একেবারে নীল সাগরের নীল জলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে সেখানে আকাশ আর জলের পার্থক্য ঘুচিয়া এক বিরাট ছায়াময় জমাট ধোঁয়ার মত প্রাকৃতিক চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া দিয়াছে। সেইখানে অন্ধকারের ক্রোড়ে এক প্রকার কালো পাহাড় জলের ভিতর হইতে উঠিয়া যেন অসীমে মিশিয়া গিয়াছে।

পাহাড়ে গাছপালা নাই, জীবজন্তুও নাই, কেবল স্থূপ স্থূপ জমাট অন্ধকারের রাশি, দেখিলেই মনে হয় যেন নিরেট অন্ধকাররাশি দিয়া সৃষ্টিকর্তা সেই পাহাড় সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অদ্ভুত অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে আবার ততোধিক অন্ধকারময় এক বিরাট গহ্বর রাক্ষসীর মুখের মত হা করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেখানে কেবল নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের মিতালি। বাতাস পর্য্যন্ত তাহার ত্রিসীমায় যাইতে ভয় পায়।

সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে অঙ্গ ঢাকিয়া অন্ধকারে গড়া বিভীষিকাময় জীব একত্রে বসিয়া পরামর্শ করিতেছিল। এরা মানুষ কি ভূত, কি রাক্ষস, কি পিশাচ, কি দৈত্য, কি দানব তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু তাহাদের সর্ব্বাঙ্গে গাঢ় অন্ধকার দিয়া গড়া বিকট আকার ও ভয়ানক হাত পা, চোখ, মুখ, নাক, কান সবই আছে অথচ কোন্টা কি

তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাহাদের দেহ প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড শক্তির  
আধার। এই বিকট মূর্তি কল্পনা করিতে প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া ওঠে। অথচ  
মানুষ লইয়াই তাহাদের খেলা, দিবারাত্রি পৃথিবীতে মানুষের উপরে  
আধিপত্য স্থাপনের ষড়যন্ত্র লইয়াই ইহারা ব্যস্ত। এইখানে হঠাৎ  
কিছুদূরে ভয়ানক কোলাহল উঠিল, বহু লোকের একত্র মিলিত রোদনের  
ধ্বনি উঠিয়া সেই অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে মিলাইল, ইহা শুনিয়া  
অন্ধকারের সেই ভীষণ জীবগুলি আনন্দে হো হো করিয়া এমন বিকট  
হাসি হাসিল যাহা বজ্রের কর্কশ ধ্বনি বা সমুদ্র-গর্জর্জনকেও হার মানায়।

মূলার মত দাঁত বাহির করিয়া বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে অন্ধকার  
হইতে একজন প্রকাণ্ড লম্বা হাত তুলিয়া লম্বা লম্বা অঙ্গুলি হেলাইয়া  
পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দেখাইয়া কহিল, “ঐ শোন লক্ষ জীব বলি দিয়ে  
মগধের রাজা পূজো করছে। শোন কান পেতে তাদের কান্নার শব্দ  
শোন, দেখবে শিগ্গিরই পৃথিবীতে আমাদের আধিপত্য হবে।”

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল তাহার নাম ‘সংশয়’। সংশয় চুপ করিয়া  
ভাবিতেছিল। এইবার সে ঘর নাড়িয়া কহিল, “না, আমার তা মনে  
হয় না। তুমি যা বললে তা কখনই হতে পারে না। তাহলে এতদিন ধরে  
এত চেষ্টা করেও আমরা সমস্ত পৃথিবী দখল করতে পারলুম না কেন?”

‘দুরাকাঙ্ক্ষা’ অমনি বিরক্ত হইয়া কহিল—“তুই সংশয় কিনা তোর  
সকল বিষয়েই সন্দেহ। কেন আমরা ত প্রায় সমস্ত পৃথিবীই দখল  
করেছি। পৃথিবীর লোক আমাদের চাকরের চাকর হয়েছে, আমাদের  
কথায় তারা উঠছে বসছে, চলছে ফিরছে, নইলে পৃথিবীতে কি দিনরাত  
হাসি-কান্নার এত শব্দ ওঠে? যা দু’দশজন জ্ঞানীলোক এখনও বশ হতে  
বাকী আছে তারা শিগ্গিরই আমাদের অধীন হয়ে পড়বে, একথা আমি  
জোর করেই বলছি।”

‘জিঘাংসা’ কহিল,—“দুরাকাঙ্ক্ষা ঠিকই বলেছে, আমি পৃথিবীময়  
রোজ ঘুরে ঘুরে দেখেছি ‘দয়া’ দেবী ছটফট করে দোরে দোরে কেঁদে

কেঁদে সেধে সেধে বেড়িয়েছে, তাকে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে, পৃথিবীতে আর তার স্থান নেই, তাই বেচারী কাঁদতে কাঁদতে বৈকুণ্ঠে ফিরে গেছে। তার দুঃখ দেখে আমি আর ‘ঈর্ষ্যা’ ঠাকুরুণ আমোদে তার পেছনে পেছনে হাততালি দিতে দিতে স্বর্গের সীমা পর্য্যন্ত গেছলুম। আমি চলে এলুম, ‘ঈর্ষ্যা’ ঠায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে।”

‘সংশয়’ আবার কহিল—“তবেই ত গণ্ডগোল—কি ঘটবে কে জানে।”

‘বাসনা’ কহিল,—“ঘটবে আবার কি? এইবারে সমস্ত পৃথিবীময় আমাদের রাজত্ব চলবে। যখন ‘দম্ভ’ বেটী পৃথিবীতে জায়গা না পেয়ে পালিয়ে এসেছে, তখন জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তির দল আর কি করবে? আমরাই ত পৃথিবীর সম্রাট হব।”

‘দম্ভ’ কহিল—“বাসনা ঠিকই বলেছে। আমরা নিশ্চয়ই এবার পৃথিবীর সম্রাট হব।”

এমন সময়ে যেন হঠাৎ ভয়ানক ভূমিকম্পে সেই অন্ধকার পাহাড়টি থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ‘দম্ভ’ বুক ফুলাইয়া আশ্ফালন করিতেছিল। সে টাল সামলাইতে না পারিয়া টলিয়া পড়িল। বাসনা চূপ করিয়া বসিয়া পড়িল। হঠাৎ ধাক্কা লাগায় জিঘাংসা দাঁতে তাহার লম্বা জিভ কামড়াইয়া কাটিল। সংশয়ের কপালটা পাহাড়ে লাগিয়া ফাটিয়া গেল। এইরূপে সেখানকার প্রত্যেকেরই আঘাত লাগিল এবং সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে ঝড়ের বেগে ঈর্ষ্যা সেখানে প্রবেশ করিল। তাহার মুখখানি ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছে, কি যেন বলিবার চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না। ঈর্ষ্যাকে এইভাবে সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গলের আশঙ্কা করিল এবং ব্যগ্র হইয়া তাহাকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঈর্ষ্যা অত্যন্ত দুর্বল বোধ করিতেছিল। ঈঙ্গিতে সে জানাইল, তাহার পিপাসা পাইয়াছে। তখনই কে একজন অন্ধকার গহ্বর হইতে এক হস্তী মুণ্ডে নররক্ত ভর্তি করিয়া

আনিয়া ঈর্ষ্যার সম্মুখে ধরিল। ঈর্ষ্যা এক নিঃশ্বাসে তা নিঃশেষ করিয়া একটু সুস্থির হইয়া কহিল—“সর্বনাশ হয়েছে। আঁটকুড়ী দয়া রাক্ষসী নারায়ণের কাছে কেঁদেকেটে লুটোপুটি খেয়ে তাঁর মন গলিয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়ে তাকে আবার পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। বলেছেন, তিনি নিজে তার দুঃখ দূর করবার জন্য পৃথিবীতে গিয়ে শাক্যকুলের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র হয়ে জন্মাবেন এবং জ্ঞানবলে সমস্ত অন্ধকার দূর করে দিয়ে রিপুদলকে তাড়িয়ে সেখানে পুণ্য রাজ্য, আলোর রাজ্য, শান্তির রাজ্য, আনন্দের রাজ্য স্থাপন করবেন। সুতরাং, সর্বনাশ হল। পৃথিবী থেকে রিপুর রাজ্য ধ্বংস হল।” দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ঈর্ষ্যা শুষ্ক মুখ অবনত করিল।

তখন রিপুদলের মধ্যে মহাআতঙ্কের ছায়া পড়িল। সকলেই গালে হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। কেবল দম্ভ ও দুরাকাঙ্ক্ষা একধারে দাঁড়াইয়া পরস্পর চুপিচুপি কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ‘মাৎস্য’ কহিল,—“এমন করে ভাবলে কিছু হবে না, এখনি এর প্রতিকার করা চাই, চল সকলে মিলে বিধাতার কাছে যাই। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, অবশ্যই রক্ষার উপায় করবেন। চল তাঁর কাছে কেঁদে পড়ে আমাদের বিপদ জানাই।”

সংশয় ঘাড় নাড়িয়া বলিল—“তাতে ফল হবে বলে বোধ হয় না। সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেই নিশ্চিত—পালনকর্তা যখন বিমুখ হয়েছেন তখন কি হয় কে জানে?”

দুরাকাঙ্ক্ষা কহিল—“সংশয় এ কথাটা বড় মিথ্যা বলে নি—সৃষ্টি কর্তা কিছুই করতে পারবেন না। বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলে নিশ্চয়ই তিনি উপায় করে দেবেন।”

দম্ভ কহিল—“তিনি কিছুই করবেন না, সৃষ্টিকর্তা যখন সৃষ্টি করেছেন, তখন সকলকেই তাদের নিজ নিজ শক্তি দিয়েছেন—সেই শক্তিবলে তারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে পারে। এত ভয়ই বা

কিসের? কেন হীনের মত সকলে মিলে নারায়ণকে খোশামোদ করতে গিয়ে আরো হীন হব? আমাদের সকলের মিলিত শক্তি কি সহজ? যেখানে দেবতারা পর্য্যাপ্ত সময়ে সময়ে আমাদের কাছে পরাস্ত হন, তখন মানুষ আমাদের কি করবে? নারায়ণ তো মানুষ হয়ে জন্মাবেন, তবে ভয় কি? চল এখন থেকে আমরা সবাই মিলে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর রাজা শুদ্ধোদনের রাজ্য ঘিরে থাকিগে এবং প্রতি পদে পদে এমন বিঘ্ন করবো—পদে পদে এমন বিপর্যয় ঘটাবো, দেখি নারায়ণ মানুষ হয়ে আমাদের কি করতে পারেন?” দম্ভ মহাদম্ভ-ভরে হাত পা নাড়িয়া সকলকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিল।

সকলেই ‘দম্ভের’ যুক্তি মানিয়া লইল, এবং ভগবানের নিকট নম্রি স্বীকার না করিয়া স্বীয় শক্তিতে পৃথিবীতে আপন আধিপত্য বজায় রাখিবে স্থির করিল।

সুতরাং সকল রিপুদল অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দল বাঁধিয়া মহা উৎসাহভরে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিল, কেবল ‘সংশয়’ নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। এইভাবে দল বাঁধিয়া চলিতে চলিতে “সংশয়” কেবল খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল।

---



# গৌতম বুদ্ধ

ॐ ॐ ॐ ॐ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি। নিম্নল নীলাকাশে পুরা চাঁদ উঠিয়াছে। তরল রূপালী প্রবাহে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ সমস্ত পৃথিবীকেই যেন হাসাইতেছে। বৃক্ষ, লতা-পাতা, দূরদূরান্তের ঐ বনানীশ্রেণী যেন এই স্নিগ্ধ রূপালী প্রবাহে স্নান করিয়া প্রকৃতি মায়ের এক অপরূপ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। এইদিকে যেন রূপের হাটে মলয়ানিলের বেসাতি বসিয়াছে, ফুলের সৌরভ লইয়া মৃদুমন্দ হিল্লোলের গতি কি অপরূপ! পাখীর কাকলি, ঝিঝি পোকের ডাক সব মিলিয়া যেন অপার্থিব সৌন্দর্য্যের স্রোত সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বহিয়া চলিয়াছে।

আজ চারিদিকেই যেন সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি, মাখামাখি। এই অপূর্ব সুন্দর সময়ে পর্বত রাজ্য কপিলবাস্তুর প্রান্তভাগে পরম সুন্দর শালবনে মহারাণী মহামায়া ভ্রমণ করিতে করিতে যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া আছেন। কপিলবাস্তু নগরে এই সময়ে বসন্তকালে মহাসমারোহে ‘দক্ষিণায়ণ’ উৎসব হইত। এই উৎসবে ছোটবড়, ইতর-বিশেষ সকলে মিলিয়া কেবল নৃত্যগীত, পান-ভোজন

ও অন্যান্য আমোদে মত্ত থাকিত, এবারও সেই উৎসব দিনে সমস্ত রাজ্যকে যেন আনন্দ রাজ্যে পরিণত করিয়াছে। এই মহাউৎসব ও আনন্দের কারণ মহারাণী মহামায়ার সন্তান হইবার সন্তাবনা।

রাজা শুদ্ধোদন পরম ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়বান, প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্যে লক্ষ্মী অচলা তাই প্রজাকুল পরম সুখশান্তিতে বসবাস করিতেছে। রাজ্যের সুখশান্তিতে রাজারও আনন্দের সীমা নাই; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাজার প্রাণে যেন এক অব্যক্ত বেদনা বিরাজ করিতেছে। কারণ তিনি নিঃসন্তান।

রাজার দুই বিবাহ—বড় মহামায়া, ছোট গৌতমী। কিন্তু পরিবারে সন্তানাদি না থাকায় সকলেই ভগবানের নিকট সন্তান কামনা করিয়া ফিরিতেছেন এবং নানা ব্রত, যাগযজ্ঞ করিতেছেন। এই সময় একদিন মহারাণী মহামায়া স্বপ্ন দেখিলেন যে, স্বর্গ হইতে এক অপূর্ব আলোক-শিখা নামিয়া তাহার চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। অসংখ্য অঙ্গুর কিন্নর তাহাকে ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে এবং এই সময়ে এক অপরূপ সুন্দর শ্বেতহস্তী আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার দেহের দক্ষিণ পাশ ছিন্ন করিয়া গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। হঠাৎ রাণীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিয়া মনে আনন্দ অনুভব করিলেন, এবং রাজাকে তাহার স্বপ্নের বিষয় বর্ণনা করিলেন, ইহাতে রাজার কৌতূহল জন্মিল। রাজ্যের সেরা শাস্ত্রজ্ঞ এবং পণ্ডিত ডাকিয়া রাজা সমস্ত বিষয় গণনা করাইয়া দেখিলেন। পণ্ডিতগণ সকলেই বিশদভাবে গবেষণা করিয়া একবাক্যে বলিলেন মহারাণী সত্যই গর্ভবতী হইয়াছেন। তাঁহার গর্ভে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে সংসারী করিতে পারিলে তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইবেন আর সন্ন্যাসী হইলেও মহৎ ধর্ম প্রচারক হিসাবে সারা বিশ্বের অন্ধকার অজ্ঞানতা দূরীভূত করিবেন, তিনি ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্যই অবতীর্ণ হইতেছেন।

এই খবরে রাজ্যময় আনন্দের ঘটা পড়িয়া গেল, রাজারাণী কল্পতরু

সাজিয়া অকাতরে অন্নবস্ত্র—ধনদৌলত দান করিতে লাগিলেন, রাজ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়া চলিয়াছে, মহামায়া এইদিন হইতেই পরম পবিত্র জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, তাহা সত্ত্বেও মহামায়ার মনে নানা ভাবনার উদয় হইত, কখনও বা আশা আনন্দের কথা কখনও ভয়ভীতিজনক নানা কল্পনা তাঁহার মনে হইত, একলা থাকিতেই তিনি খুব ভয় পাইতেন, তিনি মনে করিতেন ঐ বুঝি কে তাহাকে শাসাইতেছে—কে তাহাকে ভয় দেখাইতেছে। আবার কখনও সেই স্বর্গীয় অঙ্গরার নৃত্য ও গান এবং সেই মহা আনন্দের ধ্বনি তাঁহার কানে কোথা হইতে যেন ভাসিয়া আসে।

এইভাবে নানা চিন্তা ভাবনা—ভয়ভীতির মধ্য দিয়া দিন গড়াইয়া চলিল। রাণীর প্রসবকালের আর দেৱী নেই। দেখিতে দেখিতে রাণীর দেহে অপূর্ব জ্যোতি স্ফুরণ হইতে লাগিল। রাণীর সুখ সুবিধা ও পরিচর্য্যার জন্য রাজকীয় ব্যবস্থাদি করা হইয়াছে। তবুও যেন রাণীর ভীষণ ভয়, সব সময় ভয়ে ভয়েই যেন তাহার দিন কাটে, কখনও অমঙ্গল কখনও মঙ্গলচিন্তা রাণীর মনকে অধিকার করিয়া আছে, রাণীর যেন কিছুতেই নিস্তার নেই।

সেদিন মাঘী পূর্ণিমা, “দক্ষিণায়ণ” উৎসবের শেষ দিন। রক্ষক ও সহচরীগণ পরিবৃত্তা হইয়া রাণী বাগানে বেড়াইতে গেলেন, নিখুঁত পূর্ণিমা রাতের চাঁদের হাসি—ফুলের হাসি আর আনন্দ উৎসবের উদ্দামতা মিলিয়া রূপে—রসে—গন্ধে—গানে যেন কপিলবাস্তু ছাইয়া আছে, বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে রাণী এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তন্ময় হইয়া চকিতে এই শালবনীতে এক অতি প্রাচীন শালতরুর মূলে বসিয়া পড়িলেন। রক্ষী ও সহচরীরাও সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধা হইয়া আপন কর্তব্য ভুলিয়া এই সময় রাণীর নিকট হইতে কিছু দূরে রহিয়াছে, এই সময় রাণী একাকী ভূত-প্রেতের ভয়ে ভীষণ চমকিয়া উঠিলেন। রাণী আতঙ্কে চীৎকার করিয়া মুচ্ছিতা হইলেন। সেই চীৎকারে রাণীর রক্ষী ও

সহচরীরা চমকিত হইয়া সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে ভাবিয়া দৌড়াইয়া আসিল। তাহারা আসিয়া যা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত না হইয়া উপায় নাই। রাণী ভূতলশায়ী, রাণীর চারিদিকে চাঁদের আলোর পরিবর্তে স্বর্গীয় জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর সেই জ্যোতিতে রাণীর চারিদিকে দেবগণ বসিয়া স্তব করিতেছেন, যেন এক মহা আনন্দের হাট বসিয়াছে। এই সময় দেখা গেল রাণীর দেহের দক্ষিণ পাশ বিদীর্ণ হইয়া এক অপূৰ্ব্ব সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু সপ্তপদ অগ্রসর হইয়া গভীর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—“আমিই শ্রেষ্ঠ; পাপ, তাপ, অন্ধকার দূর হও”—এই চীৎকারে বিশ্বচরাচর কাঁপিয়া উঠিল। রক্ষক ও সহচরীরা এই চীৎকারে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল এবং দেখিল রাণীর ক্রোড়ে এক অপূৰ্ব্ব শিশু বর্তমান।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হরিষে-বিষাদ

শ্রীকালদেবল শাক্যকুলের পরম হিতৈষী ত্রিকালজ্ঞ সিদ্ধ মহর্ষি। মহারাণীর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেই তিনি জানিতে পারিয়া দেখিতে আসিলেন। কিন্তু রাজা যেমন শিশুকে আনিয়া দেখাইলেন অমনি শ্রীকালদেবল আনন্দ ও ভক্তিভরে গদগদ হইয়া সেই সদ্যোজাত শিশুকে প্রণাম করিলেন। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে শিশুও অমনি মহর্ষির মস্তকে আপনার পা ছোঁয়াইয়া দিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ‘হায় হায়’ করিয়া উঠিল—শিশুকে কোথায় মহর্ষির চরণে প্রণাম করাইয়া পদধূলি তাহার মস্তকে দিবে—না শিশু তাঁহার মস্তকে পা দিল! মহাভয়ে সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। মহর্ষি ঈষৎ হাসিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন—“ভয় পাইও না—এ অতি অদ্ভুত

শিশু, সামান্য নয়, ইহার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারে এমন শক্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে নাই। ইনি বৃক্ষতলে জন্মিয়াছেন—জম্বু-বৃক্ষতলে বসিয়া ‘বুদ্ধ’ হইবেন এবং সমস্ত পৃথিবীর শোক, দুঃখ, পাপ, তাপ অজ্ঞানতা হরণ করিয়া জ্ঞানালোক বিতরণপূর্বক ধর্মরাজ্য স্থাপন করিবেন।”

মহর্ষির কথা শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া একদৃষ্টে অপূর্ব সর্বশ্রেষ্ঠ এই শিশুর পানে চাহিল। তখন—কে জানে কি অপূর্ব দৈব-শক্তি প্রভাবে সকলের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন একটা ছায়াময় আবরণ সরিয়া গেল, অমনি সকলে দেখিল—সে রাজা শুদ্ধোদনের সদ্যোজাত শিশু নহে—নবীন-নীরদকান্তি, শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিরাট কলেবর পরম পুরুষ, তাঁহার লোমকূপে সহস্র সহস্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়া আবার লয় পাইতেছে।

সকলে মুহূর্তের জন্য জ্ঞানহারা হইল এবং পুণ্ডলিকার মত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, দিব্যচক্ষু ও দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন রাজাও সেই মুহূর্তে আপন সন্তানের চরণতলে মস্তক লুটাইলেন। পর মুহূর্তেই শিশু হাসিল, সে হাসিতে মুহূর্তেই আবার সকলের সে ভাব ঘুচিয়া জ্ঞান ফিরিল, রাজা শুদ্ধোদনেরও মোহ ভাঙ্গিয়া গেল—সকলে মনে করিল যেন এই মাত্র জাগিয়া জাগিয়াই কি একটা অপূর্ব স্বপ্ন দেখিয়াছে!

কিন্তু তখন আবার এক বিভ্রাট!—মহর্ষি শ্রীকালদেবল কি ভাবিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। হঠাৎ মহর্ষিকে এক্রূপে কাঁদিতে দেখিয়া সকলে অত্যন্ত ভয় পাইয়া বিষণ্ণ হইল। রাজা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন এবং মিনতি করিয়া করজোড়ে মহর্ষিকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীকালদেবল কহিলেন—“মহারাজ ভয় পাইবেন না, চিন্তিত হইবেন না—এ শিশুর বিনাশ নাই, কোন প্রকার অমঙ্গল হইবে না, ইনি নিশ্চয়ই ‘বুদ্ধ’ হইবেন। কিন্তু আমি বুদ্ধ হইয়াছি ততদিন বাঁচিয়া থাকিয়া

ইহার সে অবস্থা দেখিতে পাইব না। এই আমার বড় দুঃখ—বুদ্ধদেবকে দেখিতে পাইব না, এই দুঃখেই কাঁদিতেছি।”

মহর্ষি অভয় দিয়া রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু আর এক অমঙ্গলের সূচনা হইল। মহারাণী মহামায়া শাল বনে হঠাৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়া মূর্ছিত হইয়াছিলেন—সেই অবস্থাতেই নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সংবাদ পাইবামাত্রই মহারাজ অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে গৃহে আনিলেন। কিন্তু প্রসবের জন্য স্থানান্তরিত করিবার মত শক্তি তাঁহার দেহ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। সে ধাক্কা তিনি কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি একবার সজ্ঞান একবার অজ্ঞান হইতে লাগিলেন। চিকিৎসা এবং সেবা যত্ন ও শুশ্রূষার ক্রটি হইল না, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—সাতদিন পরে সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি জন্মের মত চক্ষু বুজিলেন।

রাজপুরীতে হাহাকার উঠিল—হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হইল। পণ্ডিতগণ এবং জ্যোতিষীগণ বিস্তর বুঝাইয়া রাজাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন, সকলে সর্ব্বশাস্ত্র ওলট-পালট করিয়া একবাক্যে কহিলেন—“মহারাজ, যে ভাগ্যবতী নর কলেবরে ভগবানকে গর্ভে ধরিয়াছেন, তিনি আর কি পাপ-তাপ পূর্ণ ধরায় থাকিবার উপযুক্ত? তিনি মুক্ত হইয়া পরম আনন্দধামে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করিয়া তাঁহার মুক্ত আত্মাকে আর মোহের আকর্ষণে জড়াইবেন না। এখন পরম নিধি আপনার গৃহে—তাঁহার মুখ দেখিয়া শান্ত হউন এবং সেই পুণ্যবতীর জয় ঘোষণা করুন।”

তাহাই হইল, পুত্রমুখ চাহিয়া রাজা কোনমতে মহামায়ার শোক ভুলিলেন। ছোটরাণী গৌতমী শিশুর লালন-পালনের ভার লইলেন। শিশু অপরূপ রূপ ছটায় রাজপুরী আলো করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ভবিষ্যদ্বাণী

রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া শ্রীকালদেবল আপনার ভগ্নীর গৃহে গমন করিলেন। তিনি ধনীর পত্নী, পূর্ণ সুখের সাজানো সংসারে একমাত্র পুত্র ‘নালক’কে লইয়া বাস করিতেছিলেন।

ভাগিনেয় নালককে নিকটে ডাকিয়া মহর্ষি কহিলেন—“আমি যোগ-বলে জানিলাম তোমার পরম সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। রাজা শুদ্ধোদনের এক পুত্র জন্মিয়াছে—ইনি ঈশ্বরের অবতার। ইনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে ‘বুদ্ধ’ হইবেন এবং জগতের পাপভার হরণ করিয়া পরম পুণ্যময় ও শান্তিময় ধর্ম-সাম্রাজ্য স্থাপন করিবেন। আমার দুঃভাগ্য—আমার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমি ‘বুদ্ধদেবকে’ দেখিতে পাইব না, কিন্তু তোমার সে মহাপুণ্য আছে—তুমি ‘বুদ্ধদেবকে’ দেখিবে। এখন হইতে তাঁহাকে দর্শন করিবার এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিবার উপযুক্ত হও।”

মামার কথায় নালক আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং ঘর-সংসার ও অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদ ছাড়িয়া মাথা মুড়াইলেন। তারপর গেরুয়া পরিয়া মাটির ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া গৃহ-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন এবং আপনাকে বুদ্ধদেব দর্শনের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত তিনিও সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া ধর্মচর্চায় দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এদিকে রাজ-কুমারের নাম-করণের সময় উপস্থিত হইল। রাজ্যময় আবার দান-ধ্যানের ঘট পড়িল। আমোদ-প্রমোদের শ্রোত বহিল। রাজা দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সিদ্ধ ঋষিগণকে এবং আচার্য্য ও জ্যোতিষীবর্গকে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। সেই সময়ে ‘রাম, ধ্বজ, লক্ষ্মণ, ভোজ, মন্ত্রিন, সুধাম, সুদন্ত এবং কোণাণ্য’ নামে ভারত বিখ্যাত পরম জিতেন্দ্রিয় আটজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা বহু যত্নে তাঁহাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। কপিলবাস্তু নগরে মহা-মহোৎসব আরম্ভ হইল।

রাজকুমারের নামকরণ হইল। এতকাল পরে রাজার একমাত্র প্রাণের কামনা সিদ্ধ করিয়া পুত্র জন্মিয়াছে বলিয়া তিনি নাম রাখিলেন—‘সিদ্ধার্থ’ এবং দ্বিতীয় নাম হইল—‘গৌতম’। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কপিলবাস্তু নগরে আর কেহ দরিদ্র রহিল না—রাজা, পুত্রের কল্যাণ-কামনায় কল্পতরু হইয়া রাজ-ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া ধন-রত্ন দান করিলেন।

নামকরণ-ক্রিয়া শেষ হইলে সিদ্ধ ঋষিগণ, পণ্ডিতমণ্ডলী এবং জ্যোতিষীগণ সকলেই কুমারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল গণনা করিতে বসিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিলেন—“এ কুমার ধরায় সর্বশ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয়। ইহার জন্মে পৃথিবী পবিত্র ও মঙ্গলময় হইয়াছে, ইনি মহাশক্তিশালী সার্বভৌম লোকপাল হইয়া জগতে মহাকার্য্য সম্পাদন করিবেন, অনন্ত—অনন্তকাল ইহার কীৰ্ত্তি ও কার্য্যাবলী জগতে অমর—অক্ষয়—অব্যয় ও অটুট থাকিবে।”

‘রাম’ ‘ধ্বজ’ প্রভৃতি যে আটজন সর্বশ্রেষ্ঠ দৈবজ্ঞ আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রাণপণ যত্নে, ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত সমস্ত প্রতিভা ঢালিয়া গণনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের গণনার ফল কিরূপ হয় জানিবার জন্য সমগ্র রাজসভা নীরবে উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিলেন। বহুক্ষণ পরে—সর্বশেষে তাঁহাদের অদ্ভুত গণনা শেষ হইল।

তাঁহাদের মধ্যে সাতজন তখন দুইটি অঙ্গুলি তুলিয়া সমস্বরে একবাক্যে কহিলেন—“মহারাজ, অদ্যাবধি কোন মানব-শরীরে এরূপ আশ্চর্য্য লক্ষণ সকল দেখি নাই। যাঁহার শরীরে এই সমস্ত লক্ষণ একাধারে সুপ্রকাশ সেই শিশু বড় হইয়া যদি গৃহাশ্রমে থাকেন তবে প্রতিদ্বন্দীহীন রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবেন, ইহাতে কেহ অন্যথা করিতে পারিবেন না। আর যদি তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় জ্ঞানাবতার ‘বুদ্ধ’ হইবেন।”

তাঁহাদের কথা শুনিয়া রাজার বুকের ভিতরটা হঠাৎ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, সভাজনেরাও কেমন যেন একটু শঙ্কিত হইল, কিন্তু রাজা কোন



কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না—কে জানে, যদি দৈবজ্ঞেরা শেষ কথাই নিশ্চিত বলিয়া দেন?

তখনও তাঁহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ‘কোণাগ্যের’ গণনা শেষ হয় নাই, সকলে ভয়ে এবং আশায় তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তাঁহার গণনা শেষ হইল।

‘কোণাগ্য’ একটি অঙ্গুলি তুলিয়া দৃঢ় স্বরে কহিলেন—‘যিনি যাহাই বলুন, আমি উচ্চকণ্ঠে কহিতেছি, ইনি সামান্য নর-শিশু নহেন, ইনি পরম পুরুষ সনাতন, জগতের পাপ-ভার হরণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইনি কখনই গৃহবাসী হইবেন না—সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়া ‘বুদ্ধ’ হইবেন, ইনি জগতের সমস্ত অজ্ঞান-অন্ধকার ঘুচাইয়া পবিত্র বিমল জ্ঞানালোক বিতরণ পূর্বক ধরাধাম আনন্দ-ধাম করিবেন—পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ-রাজ্য আনিয়া স্থাপন করিবেন, এ কথা শতবার মুক্তকণ্ঠে মহানন্দে ঘোষণা করিতেছি। মহারাজ আপনি ধন্য—আপনার বংশ ধন্য—আপনার প্রজামণ্ডলী ধন্য, এ শিশু শাক্যকুল পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়াছেন।’

কোণাগ্যের কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল, ইহা আনন্দের না আশঙ্কার বিষয় বুঝিতে পারিল না। আর রাজা শুদ্ধোদন? তাঁহার বুকের ভিতরটায় আনন্দ এবং আশঙ্কার আবেগ একত্র মিলিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন ভাগ্য, এমন পুণ্য, এমন গৌরব ও আনন্দের বিষয় কার হইয়াছে? শ্রীরামচন্দ্রের জন্মে যেমন রঘুবংশ চির-আনন্দ, চির-পুণ্য ও চির-গৌরবময় হইয়াছে—এ শিশুর জন্মে শাক্যকুলও তেমনি ধরাতলে অতুলনীয় পুণ্য ও গৌরবময় হইবে? ইহাপেক্ষা আর অধিক আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে?

কিন্তু—কিন্তু আজীবনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সারা-জীবনের ঐকান্তিক সাধনার ধন, রাজা-রাণীর নয়নের ধ্রুবতারা যে ঐ শিশু? দরিদ্র যেমন রত্ন কুড়াইয়া পায়, তাঁহারা যে তেমনি ঐ নয়নানন্দ পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছেন? যক্ষের ধন আগ্লাইয়া যে সুখ, অন্ধের নয়ন পাইলে যে

সুখ, ভক্তের ইষ্ট-দেবতা দর্শনে যে সুখ ঐ পুত্র-ধন কোলে পাইয়া তাঁহারা যে তেমনি সুখী হইয়াছেন! সেই সংসারের অবলম্বন—নয়নের আলোক—দেহের জীবন কুমার গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন! অনশনে তরুতলে বাস করিবেন! ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইবেন?—বাপ-মায়ের প্রাণে কত সহিতে পারে?

রাজার বুক আরো জোরে জোরে কাঁপিতে লাগিল, চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল—অতি কষ্টে তিনি তাহা রোধ করিলেন। ভয়ে ভয়ে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ইহা যদি নিতান্তই অদৃষ্ট-লিপি তবে দয়া করিয়া বলুন—কি কারণে, কি দেখিয়া, কিরূপে সে বৈরাগ্য জন্মিয়া ইঁহাকে সংসার ত্যাগ করাইবে?”

রাজা ভাবিলেন—সেই সকল জানিতে পারিলে, এখন হইতেই তিনি অত্যন্ত সাবধান হইবেন, পদে পদে সতর্কতা অবলম্বন করিবেন, সে সকল কারণ কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না—তাহা হইলে রাজকুমার আর সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন না। কিন্তু হায়রে মোহান্ব মানব, সমগ্র পৃথিবী পাপে-তাপে জজ্জরিত হইয়া মুক্তি-কামনায় অহোরাত্র যাঁহাকে কাতর স্বরে ডাকিতেছে, সমস্ত বিশ্ববাসীর আকুল আগ্রহ নিরন্তর যাঁহাকে একযোগে আকর্ষণ করিতেছে, সেই সারা ব্রহ্মাণ্ডের ঐকান্তিক প্রার্থনার বস্তুকে অন্ধ-পিতৃশ্নেহপাশে তুমি বাঁধিয়া রাখিবে?

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া কোণাণ্য তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন, তারপরে স্থির দৃঢ়স্বরে কহিলেন—“মহারাজ, কুমার সিদ্ধার্থ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ দেখিয়া, পীড়িত রোগী দেখিয়া, মৃত শবদেহ ও ভিক্ষুক মনুষ্যের এই চারি প্রকারের অবস্থা ভেদ দেখিয়া গৃহত্যাগ করিবেন। আবার বলি আপনি দুঃখিত হইবেন না—আপনার পরম পুণ্য ও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। ‘বুদ্ধদেবের’ পিতা বলিয়া আপনি বিশ্বে অমর কীর্তি এবং বৈকুণ্ঠে অক্ষয় আনন্দ-সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।”

পণ্ডিতেরা সকলে মিলিয়া ‘সিদ্ধার্থকে’ বন্দনা করিয়া বিদায় হইলেন।

তখন শাক্যকুলের বহু ব্যক্তি এবং কপিলবাস্তুর বিস্তর বিজ্ঞ প্রজা আপনাপন পুত্রসন্তান রাজকুমারকে উৎসর্গ করিয়া রাখিলেন। যদি সিদ্ধার্থ সংসার ধর্ম্মে থাকিয়া রাজচক্রবর্তী হ'ন— তবে তাহারা অনুগত সভাসদ হইবে, আর যদি রাজপুত্র সন্ন্যাসী হইয়া 'বুদ্ধ' হন তবে তাহারা সকলেই ক্ষত্রিয়-সন্ন্যাসী হইয়া সেবকরূপে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে। সেই অপূর্ব্ব শিশু-কুমার এমনি আকর্ষণে দেশবাসী সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার সঙ্গ-সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারিল না, এমন কি আপনাপন বংশধরগণকেও তখন হইতেই ভবিষ্যতে সেই সুখের অধিকারী করিয়া তুলিল।

'রাম', 'ধ্বজ' প্রভৃতি সাতজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজবাটী হইতে ফিরিয়া গৃহে আসিয়া আপনাপন পুত্রগণের কাছে 'সিদ্ধার্থের' সকল বিবরণ कहিয়া শেষে বলিলেন—“আমরা বুদ্ধ হইয়াছি, রাজকুমার সিদ্ধার্থ যখন 'বুদ্ধ' হইবেন ততদিন বাঁচিয়া থাকিব না—আমাদের ভাগ্যে সে সুখ নাই, কিন্তু তোমরা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার দাস হইয়া থাকিও।”

সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবলমাত্র 'কোণাণ্যের' বয়স অল্প ছিল। তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই ঘর, বাড়ী, পরিজন, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া 'উরুবিল্ব' নামক বনে গিয়া বাস করিলেন। সেখানে সন্ন্যাসাশ্রমে থাকিয়া প্রবৃত্তি-দমন করিতে করিতে বুদ্ধদেবের অপেক্ষায় থাকিলেন।

নামকরণ শেষ হইল, মহোৎসব ফুরাইল, কিন্তু রাজার মনের আশঙ্কা গেল না। দৈবজ্ঞের গণনার কথা দিবারাত্রি মনে পড়িয়া তাঁহাকে দিন দিন অধিকতর শঙ্কিত ও আকুল করিয়া তুলিল। রাজকুমার মহাপুরুষ হোন—অবতার হোন—বুদ্ধ হোন—যে হোন না কেন—তাঁহার বড় আনন্দের, বড় আশার, বড় সাধের বৃদ্ধকালের পুত্র—অন্ধের নড়ি—বুকের ধন! তাঁহাকে তিনি কিছুতেই সন্ন্যাসী হইতে দিবেন না।

কিন্তু দৈবজ্ঞের গণনা অদৃষ্টলিপি—ভবিষ্যদ্বাণী! তিনি সকল দিকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, আদেশ দিলেন—‘রাজবাটীর চারিদিকে এক ক্রোশের মধ্যে যেন কোন দিন, কোন বৃদ্ধ, রুগ্ন ও ভিক্ষুক না আসিতে পারে এবং কেহ শব-দেহ না আনে?’ চারিদিকে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত হইল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ আশ্চর্য্য ব্যাপার

সিদ্ধার্থ দিন দিন বড় হইতে লাগিলেন—দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলেন—দিন দিন তাঁহার রূপের জ্যোতিঃ আশ্চর্য্য রকম বাড়িতে লাগিল। সে রূপের প্রভার কাছে সূর্য্যের রশ্মি ম্লান বোধ হইল, স্নিগ্ধতা ও কোমলতার কাছে চাঁদের আলোও রুক্ষ ও প্রখর হইয়া গেল। যে একবার তাঁহার পানে দেখে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারে না।

কুমার শৈশব হইতেই ধীর-গম্ভীর-প্রশান্ত, বাল্যসুলভ চঞ্চলতার বিন্দুমাত্রও স্বভাবে নাই। যেন ‘দুধে-আলতায় রং ফলানো’ শ্বেত পাথরের গড়া পরম সুন্দর নিখুঁত পুতুলটি,—যেখানে যেমন ভাবে বসাইয়া দাও, সেখানে তেমনি ভাবে প্রশান্ত চিন্তে গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকেন। মুখমণ্ডলে বিমল আনন্দ ও শান্তির ছটা, ললাটে গম্ভীর ভাবের চিহ্ন, কোমলে-গম্ভীরে অপূর্ব সমাবেশে যেন কোন্ অমরপুরের স্বপ্নের ছবিখানি? চক্ষু পলক পড়ে—দেখায় বাধা ঘটায়, ইচ্ছা হয় নয়নের পল্লব কাটিয়া ফেলি?

আর সে কণ্ঠস্বর? পাখীর গান শুনিয়াছ, বীণার ঝঙ্কার শুনিয়াছ, আলাপের মুচ্ছনা শুনিয়াছ। কিন্তু তাতে বা কি মধুরতা—তাতে বা কি মাদকতা—তাতে বা কি সম্মোহন? কুমারের কণ্ঠস্বরের তুলনায় সে সকলই রুক্ষ, কৰ্কশ, বিরক্তিকর? সে মধুর কণ্ঠস্বর একবার শুনিলে কান ভরে, প্রাণ ভরে, মোহ আনে, কিন্তু পিপাসা বাড়ে! বারম্বার

শুনিলেও কি তৃষ্ণা মিটে? ছায়াশীতল স্বচ্ছ নদী তটে দাঁড়াইয়া কোন রৌদ্রতপ্ত তৃষ্ণাশ্বের সাধ হয় না যে গণ্ডুষে তটিনী শূন্য করিয়া শোষণ করি? রাজা রাণী বা পুরবাসীগণের ত কথাই নাই—কপিলবাস্তুর সমস্ত প্রজা—স্ত্রী-পুরুষ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন কি যাদুমন্ত্রের মোহিনীশক্তি বলে সিদ্ধার্থের প্রতি নিরতিশয় আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

যথাসময়ে রাজকুমারের বিদ্যারম্ভ হইল। তিনি ক্রীড়াশীল নহেন চিন্তাশীল, সুতরাং মনোযোগী—সে সকল অতি সহজেই অনায়াসে শিখিয়া ফেলিতে লাগিলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক চালনার শক্তি দিন দিন বাড়িয়া তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে বড়ই সহায়তা করিতে লাগিল—এইরূপে অল্পকালেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইয়া পরম পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন।

এদিকে কুমার যেমন শান্ত, গভীর ওদিকে আবার তেমনি লালসা-শূন্য, নিৰ্জ্জনতাপ্রিয়, ভাবুক, প্রেমিক। রাজপুরীর কোলাহলের ভিতরে তাঁহার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিত—তিনি নিৰ্জ্জন স্থানে পলাইয়া গিয়া আপন মনে কে জানে কি গভীর ভাবে মগ্ন হইতেন। শোভাময়ী নগরীর কৃত্রিম কারু-সৌন্দর্য্য সকল দেখিয়া তিনি উপেক্ষা ও অতৃপ্তির হাসি হাসিতেন,—নিৰ্জ্জন পর্ব্বতে কিম্বা সুরম্য কাননে গিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া পড়িতেন। ঐশ্বর্য্য ও ভোগ বিলাসকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন—রাজপুরী হইতে পলাইয়া দূরে পল্লী ভবনে সরল নিরীহ দরিদ্র কৃষককুলের সহিত মিশিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। সঙ্গীরা সর্ব্বদা খেলা-ধূলা, হাসি, খুশী, আমোদ-আহ্লাদে মাতিত—তিনি সেই সময়ে পাশ কাটাইয়া তাহাদের নিকট হইতে পলাইয়া কোন নিৰ্জ্জন স্থানে গিয়া—কে জানে কি গভীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া মগ্ন হইতেন। সঙ্গীরা খুঁজিয়া বাহির করিলেও, ডাকিয়া হঠাৎ সাড়া পাইত না। এইরূপে শৈশব-জীবনের মধ্যেই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধার্থের ভাবুকতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা বাড়িয়া সেই অত্যল্প বয়সেই তাঁহার প্রাণে বিশ্বপ্রেমের তুফান বহাইতে আরম্ভ করিল।

কপিলবাস্তু রাজ্যে প্রতি বৎসর যথানিয়মে ‘হলকর্ষণ’ উৎসব হইত।

এটা শাক্যকুলের বহু প্রাচীন কুলরীতি। সেই উৎসব উপলক্ষে সমস্ত রাজধানী সজ্জিত হইত—নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদের ঘটা পড়িয়া যাইত। আর রাজপুরীর ত কথাই নাই। রাজসভা বিবাহ সভার মত সুন্দর রূপে সাজানো হইত, ভৃত্য ও সেবকগণ নূতন নূতন কাপড় পরিয়া, ফুলের মালা গলায় দিয়া সভায় সমবেত হইত। সভাসদগণ আপনাপন সর্বোৎকৃষ্ট সুরম্য বসন-ভূষণে সাজিয়া আসিয়া যোগ দিতেন। তখন উৎসব আরম্ভ হইত।

রাজার এক হাজার লাঙ্গল ছিল, তার মধ্যে একশো সাতখানি লাঙ্গল রূপার পাতে মোড়া হইত এবং একখানি সোনার পাতে মুড়িয়া ফুলের মালায় সাজানো হইত! রাজা সোনার লাঙ্গলখানি লইতেন, সভাসদেরা রূপার লাঙ্গলগুলি লইতেন এবং প্রজাবৃন্দ অন্য লাঙ্গলগুলি লইয়া তাঁহাদের পিছনে পিছনে মাঠে আসিত।

তারপর রাজা মাঠে আসিয়া সেই লাঙ্গল দিয়া আপন হস্তে ক্ষেতের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত চষিয়া যাইতেন, সভাসদেরা তাঁহার আশেপাশে এদিক-ওদিক করিয়া চষিতেন, তারপর সমস্ত প্রজা মিলিয়া বাকী লাঙ্গলগুলি দিয়া সমস্ত মাঠ সম্পূর্ণরূপে চষিয়া ফেলিত। ইহাই ‘হলকর্ষণোৎসব।’ এই উৎসব দেখিবার জন্য নগরের ছেলে বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে সকলে মাঠের ধারে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। কপিলবাস্তু নগরে সেই ‘হলকর্ষণের’ উৎসব আরম্ভ হইল।

রাজা সভাসদগণ দাসদাসী এবং প্রজামণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া সিদ্ধার্থকে সঙ্গে লইয়া মাঠে চলিলেন, কুমারের জন্য যে সকল পরিচারক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারাও সাজিয়া-গুজিয়া সঙ্গে চলিল।

মাঠের এক ধারে একটি পুরাতন ‘জম্বু’ বৃক্ষ ছিল, তার তলে ছায়াতে সুন্দর সুকোমল বিছানা পাতিয়া কুমারকে বসাইয়া রাখা হইল। সেইখানে বসিয়া তিনি লাঙ্গল-চষা সমস্তই দেখিতে পাইবেন। রক্ষক ও দাসদাসীদের তাঁহার চারিদিকে রাখিয়া রাজা অন্যান্য সকলের সঙ্গে লাঙ্গল হাতে করিয়া ক্ষেতে গিয়া নামিলেন।

উৎসব আরম্ভ হইল। ক্ষেতের চারিদিক বেড়িয়া নগরবাসী ও

বাসিনীগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে পরম উৎসাহে দেখিতে লাগিল। কুমারের চাকর দাসীরা সেই উৎসব দেখিবার আনন্দে মাতিয়া বিমনা হইয়া পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার কাছ হইতে কিছু দূরে সরিয়া পড়িয়া সেই উৎসব দর্শনের আনন্দে মাতিল, কুমারের কথা তখন আর কাহারও মনে রহিল না—কুমার একাকী হইয়া পড়িলেন।

অমনি মাথার উপরে প্রভাতের স্বচ্ছ নীল আকাশের পানে চাহিয়া সিদ্ধার্থ বিভোর হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ে মহা ভাবের তরঙ্গ উঠিল, তিনি সেই অনন্ত মুক্ত প্রকৃতির কোলে অনন্তময়ের অনন্ত প্রেমের সাগরে ডুবিয়া গেলেন! দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, চক্ষের তারা উপরে উঠিল, বিশ্ব চরাচর ভুলিয়া তিনি মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া উৎসব চলিল। শেষ হইলে সকলে দেখিল যে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে—সূর্য্য আকাশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে একটু হেলিয়া পড়িয়াছেন। রৌদ্রে কাঠ ফাটিতেছে।

তখন দাসদাসীদের কুমারের কথা মনে পড়িল, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল—অদ্ভুত ব্যাপার!

চারিদিকে ঝাঁঝী রৌদ্র—যেখানে যত গাছপালা ছিল তাদের ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে। কুমার জম্বু গাছের পশ্চিমে ছিলেন, সকালে সেখানে ছায়া ছিল এখন তাহার মাথা ছাড়াইয়া সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়াছে সুতরাং সেদিকে সে ছায়া থাকিবার কথা নয়, কিন্তু সে গাছের ছায়া বিন্দুমাত্রও স্থানত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে সরে নাই—বরং আরো ঘন এবং স্নিগ্ধ হইয়া গোল ভাবে কুমারের চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া হঠাৎ সকলে একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, পরমুহূর্ত্তে আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

চাকরদের সর্দার হঠাৎ মহা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল—“কি সর্ব্বনাশ—ওরা কে?”

তাহার মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে সকলে সভয়ে দেখিল একদল ভয়ানক কালো মস্ত লম্বা লম্বা কিণ্ডুতকিমাকার অন্ধকারের

আকৃতি—না পুরুষ না মেয়ে—না মানুষ না পশু—কি যেন কি একজোটে গাছের ছায়ার চারিদিকে গোল হইয়া কুমারের ঘাড়ে গিয়া পড়িবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছে না—মস্তঃপুত গম্ভীর মত গাছের ছায়াটা তাহাদের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

দিন দুপুরে এই অদ্ভুত কাণ্ড চাক্ষুষ দেখিয়া সকলের সর্বাস্ব ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কেহ আর এক পা অগ্রসর হইতে পারিল না, মুখ দিয়া কথা সরিল না—কেবল দারুণ আতঙ্কের একটা বিকট চীৎকার সকলের মুখ হইতে এক সঙ্গে বাহির হইয়া চারিদিকের আকাশ বাতাস কাঁপাইল।

রাজা সবেমাত্র লাঙ্গল ছাড়িয়া ঘাম মুছিতেছিলেন। সেই চীৎকার ক্ষেতের মধ্যে তাঁহার ও অন্যান্য লোকের কানে পৌছিল। কুমারের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল—তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া জম্বু তরুর দিকে ছুটিলেন। উপস্থিত দর্শকগণের আমোদ আহ্লাদ টুটিল, কুমারের জন্য বুক কাঁপিয়া উঠিল, সকলে রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিল—কুমার যে সকলেরই নয়নানন্দ প্রাণাধিক প্রিয়তম হইয়া উঠিয়াছিলেন।

কুমারের দাসদাসীরা তখন পর্য্যন্ত সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে ছিল, তখন পর্য্যন্ত সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য অন্তর্হিত হয় নাই। মেঘমণ্ডল মধ্যবর্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রাজকুমারের মুখমণ্ডলের দিব্য জ্যোতিঃ তখন পর্য্যন্ত গোলাকার কৃষ্ণ অমঙ্গল রাশির মধ্যে উজ্জ্বল ছটায় বৃক্ষতল আলোকিত করিয়া খেলিতেছিল।

রাজা ও প্রজাবর্গ সকলেই সেই বিচিত্র অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই মার মার শব্দে কুমারের চারিদিকে গিয়া ঘিরিল। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে ছায়ামূর্তি সকল শূন্যে মিলাইয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া সিদ্ধার্থের ধ্যান ভাঙ্গিল, রাজা তাড়াতাড়ি পুত্রকে কোলে লইয়া মুখ চূষন করিতে করিতে গৃহে আনিলেন।



## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### বিবাহ

রাজকুমার গৃহে আসিলেন, মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, কুলনারীরা মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে তাঁহাকে ফুলের মালা ও চন্দনে সাজাইয়া চাঁদমুখ দেখিতে দেখিতে আনন্দে মগ্ন হইল।

কিন্তু কুমারের মুখের বিষণ্ণতা ঘুচিল না। তিনি সকল বিষয়ে উদাস হইয়া আনন্দে যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া সকলেই বিষণ্ণ হইল; রাজা উৎকণ্ঠিত চিন্তে আদর করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমার কহিলেন—“পিতা ভাবিয়া দেখুন দেখি লাঙ্গল চষার মধ্যে কত নিরীহ ক্ষুদ্র প্রাণী প্রাণে মরিয়াছে! আহা, মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তারা কত কাঁদিয়াছে, কত ছটফট করিয়াছে, শেষে কি দারুণ যন্ত্রণাতেই না জানি প্রাণ দিয়াছে? তাহাদের দুঃখ ভাবিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে। আমার তুচ্ছ বিপদ আশঙ্কা করিয়া আপনারা দেশশুদ্ধ লোক ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কোলে লইয়াছিলেন, কিন্তু হয় অতগুলি প্রাণভয়ে ভীত নিরীহ জীবের যথার্থ বিপদের সময়ে আকুল ক্রন্দন কেন গ্রাহ্য করেন নাই। এ দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে—আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভাল লাগিতেছে না, আর এ রকম কার্য্য কখনও আদেশ করিবেন না।”

শিশু কুমারের মুখে সেই আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া, সেই বয়সে সারা জীবের প্রতি সেই অপার করুণা দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে নিব্বাক হইয়া গেল। রাজার মনে দৈবজ্ঞ ‘কোণ্ডাণ্যের’ ভবিষ্যদ্বাণী জাগিল—‘এ শিশু কখনো গৃহে থাকিবে না, সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বুদ্ধ হইবে।’ তাঁহার বুকের ভিতরটা আবার ধড়াস্ করিয়া উঠিল!

দিন যাইতে লাগিল, সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন। কিন্তু যতই বয়স হইতে লাগিল ততই তিনি দিনে দিনে সকল বিষয়ে লালসামূল্য —সকল বিষয়ে অধিকতর উদাসীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ততই

দিনে দিনে তাঁহার ধ্যানশক্তি বাড়িতে লাগিল, রাজবাটীর কোলাহল ঐশ্বর্য্য, বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ ছাড়িয়া কেবল নিৰ্জ্জনতা খুঁজিতে লাগিলেন।

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই মনে মনে দুঃখিত হইল, রাজা চিন্তিত হইলেন এবং সংসারে তাঁহার মন বসাইবার জন্য নানারকম উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। নিত্য নূতন নূতন সুন্দর সুন্দর বস্তুতে নূতন নূতন রকমে রাজবাটী সাজানো হইতে লাগিল, নূতন নূতন রকমের নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং নূতন রকমে সিদ্ধার্থের মন ভুলাইবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

এদিকে রাজকুমার পরম পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, বন্ধুবৎসল, সর্ব্বজনে প্রেমময়, সরলহৃদয়, উদারচরিত্র, মিষ্টভাষী, করুণার আধার, মধুর—মধুর স্বভাব! কারো মনে অজ্ঞাতে একটুমাত্র কষ্ট দিতেও তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যায়। যে যা বলে—যে যা চায়—যে যাতে সুখী হয়—তাই করিতে তিনি সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত। সামান্য দাসদাসী হইতে রাজধানীর প্রজাবর্গ, সভাসদগণ আত্মীয়স্বজন এবং রাজরাণীর একান্ত বশীভূত। সুতরাং যে তাঁকে যখন যে ভাবে রাখিতে চায়—তিনি সেইভাবে থাকেন, রাজরাণী তাঁহাকে যেমনটি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদাই তেমনটি হইয়া থাকেন। কেহ একদিন একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে অবাধ্য দেখিতে পায় না, কোন বিষয়ে তাঁহার প্রতি কোনরূপ অনুযোগের কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না।

তবু সকলের সদাই ভয়—সদাই আশঙ্কা—পাছে তিনি বিরাগী হন। রাজরাণী তাঁহাকে পলকে হারান। তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সকল সময়ে সকলের নিতান্ত অনুগত থাকিয়াও—তবু কারো প্রাণের গোপন উৎকণ্ঠা দূর করিতে পারেন না। সকলকে সুখী করিবার জন্য—সকলকে আনন্দ দানের জন্য তিনি অষ্টপ্রহর সকল রকম ঐশ্বর্য্য-বিলাস এবং আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গে ডুবিয়া থাকিয়াও—কেমন স্বভাবতঃ লালসাস্থূণ্য—কেমন স্পৃহাস্থূণ্য—কেমন নিতান্ত উদাসীন। এভাবে যে

তাঁরা প্রাণে আপনা হইতেই অস্থি-মজ্জায় শিরাশোণিতে দৃঢ়রূপে বসিয়া গিয়াছে—এ যে তাঁর শৈশব হইতেই স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে—তিনি কি করিবেন?

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। রাজারাণীর সহস্র চেষ্টা, সহস্র আকিঞ্চন সহস্র উদ্যোগ আয়োজনেও কুমারকে সংসার-সুখে বাঁধিতে পারিল না—দিন দিন তিনি অধিকতর চিন্তাশীল, অধিকতর ধ্যানরত, অধিকতর উদাসীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন রাজ-রাণীর ভয় ও উৎকণ্ঠা বাড়িল।

কুমারের চিন্তায় সভাসদগণ এবং প্রজামণ্ডলীও নিশ্চিন্ত নহে, নিশ্চিন্তে কারো পেটে অন্ন যায় না, হাসি-তামাসা, আমোদ-প্রমোদে মন লাগেনা। কি করিয়া নয়নানন্দ প্রাণাধিক রাজকুমারকে সংসারী করিবে, সকলে কেবল সেই ভাবনাই ভাবিতে লাগিল।

অবশেষে এই যুক্তি ঠাওরাইল। যদি একটি গুণবতী, রূপবতী কন্যার সঙ্গে কুমারের এইবেলা বিবাহ দেওয়ানো যায় তা হইলে তিনি আর এরূপ উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। যুক্তি, তর্ক, উপদেশ এবং অন্যপ্রকার সহস্র চেষ্টা অপেক্ষা রূপ-গুণশালী বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর মন সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে অধিকতর পটু। এই ভাবিয়া তাহারা রাজার কাছে গিয়া মনের ভাব জানাইল। রাজা দেখিলেন কথাটা ঠিক বটে, তিনি তখন কুমারের বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়া কন্যা দেখিতে লাগিলেন।

যেমন বর কেনেও সেই রকম আবশ্যক, নহিলে দাম্পত্য-মিলন সুখ ও শান্তির হয় না। সেইজন্য বিশেষ যত্নে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া মেয়ে দেখা আরম্ভ হইল।

এদিকে বিবাহ করিতে কুমারের মন আছে কি না তাহা জানিবার জন্য রাজা অমাত্যবর্গকে কহিলেন। তাহারা আসিয়া ছলে কৌশলে একদিন কথাটা পাড়িয়া তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার কহিলেন—“আমাকে সাত দিন সময় দিন, কর্তব্য স্থির করিয়া মতামত জানাইব।”

সিদ্ধার্থ বিষম ভাবনায় পড়িলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে বিষয়-কর্মে উদাসীন দেখিয়া মহারাজ এইবারে বিষম বন্ধনে বাঁধিতে চাহিতেছেন। পিতার ইচ্ছা—গুরুজনের আদেশ প্রতিপালন করা পুত্রের ধর্ম ও কর্তব্য, সে ধর্ম ও কর্তব্যে অবহেলা করিয়া তাঁহার মনে ব্যথা দেওয়া তিনি মহা পাপের কার্য্য ভাবিলেন। শুধু তাই নয় পিতৃভক্ত সহৃদয় পুত্র বুঝিলেন যে পিতার বাক্য অবহেলা করিলে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইবেন, তাঁহার সেই দুঃখ ভাবিয়া তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা লাগিল, বুঝিলেন, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বিবাহ করাই নিতান্ত কর্তব্য।

কিন্তু তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া থাকিবেন? ভোগ বিলাসে অনন্ত দুঃখ, বিজন বনে গিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি দমন করিয়া ধ্যান সমাধিতেই প্রকৃত সুখ। তাহাতে যে পরম জ্ঞান লাভ হয়, বিমল আলোকে প্রকৃত পথ দেখিতে পাওয়া যায়—সাংসারীকে সেই পথ দেখাইতে পারিলে তাহাদের শোক তাপ দুঃখ দূর হইতে পারে। তিনি সে চেষ্টা ছাড়িয়া কি মোহপাশে চিরদিন বাঁধা পাড়িয়া থাকিবেন? তবে আর জগতের দুঃখ দূর করিবেন কেমন করিয়া? এইরূপ নানা চিন্তায় কয়দিন কাটিয়া গেল—কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না শেষে একদিন ভাবিতে ভাবিতে গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন।

সেই ধ্যানে তাঁহার কর্তব্য স্থির হইল। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, যদি বিবাহ না করিয়া সকলেই মুক্তিলাভের ইচ্ছায় সংসার ছাড়িয়া বনবাসী হয়, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে সংসার আশ্রম লোপ পায়। ঈশ্বরের তাহা ইচ্ছা নহে তাহা হইলে সংসার থাকিত না—সৃষ্টি লোপ পাইত। সকল ছাড়িয়া বনে গিয়া ধর্ম উপার্জন করা সহজ, গৃহে থাকিয়া ধর্মপথ লাভ করাই কঠিন। গৃহিণীকে শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের মত গৃহে থাকিয়াই পরম পথ আবিষ্কার করিয়া দেখাইতে হইবে, তবে তাহারা সে পথ চিনিয়া মুক্তির পথে যাইতে পারিবে তবেই জীবের দঃখ দূর হইবে, নহিলে শুষ্ক কঠোর সন্ন্যাস ধর্মে ও শুভফল পাওয়া যাইবে না। গৃহী হইয়াও কেমন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া

মুণ্ডি লাভ করা যায় তিনি তাঁহার আদর্শ দেখাইবেন। সিদ্ধার্থের কর্তব্য স্থির হইয়া গেল, তখন অমাত্যবর্গকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন।

রাজা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দণ্ডপাণি নামে এই ব্যক্তির পরমা সুন্দরী গুণবতী ও সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক কন্যার সহিত শুভদিনে পুত্রের বিবাহ দিলেন।

উনিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের বিবাহ হইল, স্ত্রীর নাম—গোপা।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### প্রমোদ ভবন

নদীর জলে চাঁদের আলোর যেমন শোভা, চাঁদের আলোকে ফোটা ফুলের যেমন শোভা, দেবতার পায়ে ফোটা ফুলের যেমন শোভা—সিদ্ধার্থের সহিত গোপার মিলনে তেমনি শোভায় কপিলবাস্তু শোভাময় হইয়া উঠিল।

এই বিবাহ উৎসবে মাতিয়া সমস্ত নগরবাসী নগরখানিকে কিছুদিনের জন্য আনন্দ রাজ্য করিয়া ফেলিল। সকলেই আপনাপন বাড়ী মঙ্গল-কলস, আশ্রপল্লব, কলাগাছ, ফুল, পাতা ও পতাকায় সাজাইল, প্রতি গৃহ হইতে নৃত্য-গীত বাদ্য আমোদ-প্রমোদের তরঙ্গ ছুটিল।

আর রাজরাজরার ত কথাই নাই, ইন্দ্রের অমরাবতীকেও হারাইয়া সাজ-সজ্জা, গীত-বাদ্য, পান-ভোজন, দান-ধ্যান, উৎসব-আনন্দের সজীব মূর্ত্তি হইয়া উঠিল। লোকে স্বর্গ ভোগের কামনা করিয়া তপস্যা করে, কিন্তু সে সময়ে কপিলবাস্তুর রাজপুরী দেখিলে তাহারা স্বর্গের কথা নিশ্চয় ভুলিয়া যাইত।

কিন্তু যাঁহার জন্য এত, তাঁহার তখন কি অবস্থা? পিতার আদেশ পালন করিয়া সন্তানের কর্তব্য কার্য্য করিতে কুমার বিবাহ করিলেন।

শুধু তাহাই নয়—সংসারে থাকিয়া তাঁহার উচ্চ কার্য সাধনের একজন সহায় পাইবেন, জীবনের মহাব্রত পালন করিবার পক্ষে একজন জীবন-সঙ্গিনী পাইবেন, ধর্ম জীবনে চলিবার পথে একজন সহধর্মিণী পাইবেন, আপনার মনোমত ভাবে তাঁহাকে আদর্শে গড়িয়া সেই আদর্শ লোকের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সকলকে সেই পথে চালাইবেন—ইহাও তাঁহার মনের ইচ্ছা। স্ত্রী ধর্ম-পথের কণ্টক নহে, ধর্ম-পথের প্রধান সহায়—ইহা প্রমাণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ধর্মের বন্ধন দৃঢ় করিবেন। তাই তিনি বিবাহ করিলেন।

তাঁহার সে ইচ্ছা সফল হইল কি? যেমনটি পাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তেমনি স্ত্রী-রত্ন পাইলেন কি? তাঁহার মনের বাসনা মিটিল কি? মিটিল বই কি?

যখনই সর্বপ্রথম পরস্পর পরস্পরের পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, সেই সর্বপ্রথম দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের নিভৃত তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন। সেই দেখায় দুজনেই দুজনাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিলেন—দুজনেই দুজনাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিলেন।

একি! এয়ে—সেই—সেই চিরকালের পরিচিত, দুজনাতে যে কত যুগ-যুগান্তের জানাশোনা—চিরকালের আলাপ—চিরকালের আপনার! চিরদিনই যে তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা—পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা—পরস্পর একাত্মা অভেদ! এখন পরস্পর পরস্পরকে পাইয়া দেখিলেন—চিনিলেন—জানিলেন, পরস্পর পরস্পরের হৃদয়ের তলে ডুবিলেন—দুটি প্রাণে আবার এক হইয়া মিলিয়া গেলন!

গোপা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী—তেমনি ধার্মিকা। সুতরাং সিদ্ধার্থের সহিত তাঁহার মিলনে মণি-কাঞ্চণ সংযোগ হইল। সেই বিবাহ দিন হইতেই দুটি হৃদয় এক সঙ্গে মিশিয়া একধ্যানে একটানে এক প্রবল মহাস্রোত বহিল। সেই স্রোতের একটানা বেগে—লজ্জা-সঙ্কোচ-সম্ভ্রমের বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল। কুমার সকল ভুলিয়া—মগ্নহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া গোপার মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

গোপাও এতদিনের হারানিধি কুড়াইয়া পাইয়া আঁচলে গিঁট দিয়া বাঁধিলেন।

রাজা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া এত দিনে যেন নিশ্চিত হইলেন, তাঁহার অন্তরে সুখের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, নব-দম্পতির প্রেম-বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি আপনাকে ধন্য ভাবিলেন। নগরবাসী প্রজাবৃন্দও পরম সুখে ভাসিয়া উৎসাহে ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সকলেরই হৃদয় শান্ত ও মন নিশ্চিত হইল—রাজকুমার গৃহধর্ম্মে আর উদাসীন থাকিতে পারিবেন না। হয়—ভবিষ্যৎ দৃষ্টি-হীন অন্ধ মানব।

কিন্তু তবুও রাজার মন হইতে সেই দৈবজ্ঞ কোণাণ্যের ‘গণনা’ একেবারে মুছিয়া গেল না। ‘রাজপুত্র গৃহবাসী হইবেন না, মৃত, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও ভিক্ষুক দেখিয়া সংসার ত্যাগ করিবেন, সন্ন্যাসী হইবেন’ এই কথা কয়টি থাকিয়া থাকিয়া একটা দুঃস্বপ্নের মত তাঁহার মনের আনন্দ নিবাইয়া দিতে লাগিল, ব্রাহ্মণের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মাঝে মাঝে কাঁটার মত বুকে ফুটিতে লাগিল। তিনি কুমারকে এই বন্ধনের উপরে আবার নূতন বন্ধনে বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন।

রাজা মনে মনে নানারূপ ভাবিয়া শেষে কুমারের বাস করিবার জন্য একটি অপরূপ ‘প্রমোদ-ভবন’ নির্মাণ করাইলেন। সমস্ত ভারতের সর্বাপেক্ষ সুন্দর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্প-নৈপুণ্যে সেই ভবন প্রস্তুত হইয়া—অপূর্ব ছবিখানির মত দর্শকের চক্ষে স্বপ্নরাজ্যের সৌন্দর্য্য ছড়াইতে লাগিল। পৃথিবীর সকল স্থান খুঁজিয়া—যেখানকার যে বস্তু সুন্দর—তাহা আনাইয়া সেই বাড়ী সাজাইলেন। যেখানকার যে বস্তু আশ্চর্য্য, যেখানকার যে বস্তু চিত্তাকর্ষক, যেখানকার যে বস্তুতে ভোগ-বিলাসের বাসনা বাড়ায় তার একটিও বাদ পড়িল না। ষড়-ঋতুতে প্রকৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন রকমের নব নব সৌন্দর্য্যে শোভাময় হইয়া উঠে, সেই রকম আশ্চর্য্য চমৎকার মনোমদ ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পদ একত্রে একাধারে মিলিয়া প্রমোদ-ভবনে বারোমাস বিভিন্ন ঋতুগুলিকে যেন একসঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। কে বলে মর্ত্যে স্বর্গের কল্পনা হয় না? গৌতম—৩

কে বলে—স্বর্গের চেয়ে সুন্দর স্থান নাই। কে বলে—স্বর্গ কবির কল্পনা আকাশ-কুসুমের মত? একবার কপিলবাস্তুতে সিদ্ধার্থের ‘প্রমোদ-ভবন’ দেখ—সে ভুল ধারণা মুছিয়া যাইবে।

কেবল ইহা করিয়াই রাজা ক্ষান্ত হইলেন না। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নর্তকী ও গায়িকা দলে দলে আনাইয়া প্রমোদ-ভবনে রূপের হাট বাসাইলেন। তাহাদের রূপের কাছ অঙ্গরা-কিন্নরীর দল কুৎসিত হইয়া যায়, কণ্ঠস্বরে কোকিল-পাপিয়া লজ্জা পায়, নৃত্য-গীতে উর্বসী-মেনকা মুখ লুকায়। শরতের পূর্ণচন্দ্রের বিমল রূপের ভাতি ছড়াইয়া তাহারা দিবারাত্রি প্রমোদ-ভবন আলো করিয়া রহিল।

তার উপর বেনু, বীণা, মুরজ, মুরলী প্রভৃতি সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সহিত সর্বশ্রেষ্ঠ বাদকগণ নিযুক্ত হইল, পৃথিবীর প্রাপ্ত পর্য্যন্ত খুঁজিয়া সকল দেশের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ উপকরণ সকল আনীত হইল। বাদক ছাড়াও আপনা-আপনি বাজে—এরূপ আশ্চর্য্য বিরল বাদ্যযন্ত্রও বাকী রহিল না।

এইরূপে—কুমারের ভোগবিলাসে স্পৃহাশূন্য—সংসারাত্মমে কামনা-শূন্য—উদাস হৃদয়কে দৃঢ়রূপে সংসারে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য যে কিছু সম্ভব বা অসম্ভব উপায় ও উপকরণ যেখানে ছিল রাজা সে সমস্তই আনাইয়া প্রমোদ-ভবনে জড় করিলেন। যদি স্বর্গবাসে মানুষের সুখ থাকে, যদি স্বর্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষায় মানুষ তপস্যা করে, যদি স্বর্গের প্রলোভনে মানুষ সর্বত্যাগী হইতে পারে তবে কপিলবাস্তুর এই পার্থিব চাক্ষুষ স্বর্গ রাজপুত্রকে নিশ্চয়ই তাহার সহস্র সহস্র লালসা-বাহু বেষ্টন করিয়া—মাকড়সার জালের মত—আটকাইয়া দৃঢ় আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিবে। এতদিনের সকলে আশ্বস্ত হইল—এতদিনে সকলের মন হইতে যেন একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল। এইবার রাজা প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন, তাহার চিত্তিত মুখে আবার আনন্দের ছবি ফুটিয়া উঠিল। পুত্রকে সংসারী করিবার কৌশল সফল হইবে। কিন্তু হায়, পৃথিবীতে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করিতে পারে?



গোপার সহিত সিদ্ধার্থ আসিয়া সেই—মর্ত্যের স্বর্গ—প্রমোদ-ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। চারিদিকে শোভা—চারিদিকে আলো—চারিদিকে হাসি—চারিদিকে গান—চারিদিকে অষ্টপ্রহর কেবল আনন্দের ছাড়াছড়ি? রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, ও গানের তরঙ্গ একসঙ্গে মিশিয়া দিবানিশি প্রমত্ত আমন্দ ও নিরবচ্ছিন্ন সুখের তুফান ছুটাইল। সে তুফানের প্রবল-তরঙ্গে পড়িয়া সিদ্ধার্থ আত্মহারা হইয়া গোপার সঙ্গে ভাসিয়া চলিলেন। আর কখনো যে সে উন্মত্ত প্রচণ্ড তরঙ্গের মধ্যে হইতে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা মাত্র রহিল না।

গোপা ছায়ার মত স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে জড়িতা, সখীর মত হিতাকাঙ্ক্ষী, দাসীর মত সেবিকা, কন্যার মত ভক্তিমতী, জননীর মত স্নেহময়ী, ভাঁড়ের মত কৌতুক হাস্য-পরায়ণা, মদিরার মত হৃদয়-প্রাণ-উন্মত্তকারিণী। তিনি যথার্থ পত্নী—প্রকৃত সহধর্মিণী—স্বামীর প্রতি-কার্য্যের অনুসারিণী ও সাহায্যকারিণী। এমন স্ত্রী-রত্ন পাইয়া সিদ্ধার্থ আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিলেন, সুতরাং তিনি যে সেই প্রেমময়ীর প্রেম-প্রবাহে সকল ভুলিয়া ডুবিয়া যাইবেন—তাহার আর কথা কি?

স্বামী স্ত্রী দু'জনের এক মন, এক প্রাণ, এক উদ্দেশ্য, এক সুখ, এক আশা, এক লক্ষ্য এক সাধনা। সিদ্ধার্থ এতদিন নিজের উদ্দেশ্য-পথে একলা চলিতেছিলেন, সংসার তাঁহার সে পথে গমনে সহানুভূতি দেখায় নাই—তিনিও ক্রমে ক্রমে সংসার হইতে তফাতে সরিয়া পড়িতেছিলেন। এখন এমন সঙ্গিনী পাইয়া চক্ষু নূতন আলো ফুটিল—নূতন আলোতে নূতন পথ দেখিলেন। সে পথ বড় সরল, বড় সুন্দর—বড় সরস, ছায়াশীতল! উন্মত্তবৎ সে পথে চলিলেন। তাঁহার উদাসীনতা ঘুচিল, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য কমিল—সকল ভুলিয়া গোপাতে ডুবিলেন।

## সপ্তম পাব্ৰ্ষেদ

### জাগরণ

দিন কাটিতে লাগিল, বৎসর অতীত হইয়া গেল—সিদ্ধার্থের মুখে কার্য্যে কি কথায় আর উদাস ভাবের ছায়ামাত্র নাই। তিনি—গোপাময়, গোপা—সিদ্ধার্থময়, দুজনে দুজনাতে আত্মহারা। পরম সুখে হাসি আনন্দে সুখ ও সন্তোষের মধ্য দিয়া অতি সহজে জলের মত দিনগুলো কাটিয়া যাইতেছে!

গোপার গর্ভ লক্ষণ দেখা দিল, রাজারাণীর আর আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। কবে কোন্ অতীতকালে শাস্ত্র ব্যবসায়ী দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ গণনা করিয়া কুমারের সম্বন্ধে যে অমঙ্গলময় ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল— তাহা আর তাঁহাদের মনেও পড়ে না। দিন দিন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া তাঁহারা তাহার উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়া উঠিতেছেন। শত আশা, শত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে দিবারাত্রি তোলপাড় করিয়া ছুটিতেছে।

তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, এইবার পরম গুণবান পুত্রের হস্তে রাজ্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইবেন। পুত্রের মস্তকের উপর রাজছত্র দেখার অপেক্ষা অধিক সুখ, অধিক সৌভাগ্য, অধিকতর পুণ্যের বিষয় মানব-জীবনে আর কি হইতে পারে? সেই সুখের কল্পনা করিয়া তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছেন! প্রজাগণও তাঁহাদের মনের ভাব জানিতে পারিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে! কবে সেই শুভদিন আসিবে, কবে সিদ্ধার্থ রাজমুকুট মাথায় দিয়া সিংহাসন আলো করিয়া বসিবেন তাহার জন্য দিন গণিতেছে। সমস্ত কপিলবাস্তু একটা অদম্য আশার আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত প্রমোদ-ভবনে নাচগান হাসি-কৌতুক আমোদ-প্রমোদের শ্রোত বহিয়া অলক্ষণ হইতে নীরব হইয়াছিল।

ফুলগন্ধে পরিপূর্ণ নৈশবায়ু সেই আনন্দের নীরব ঝঙ্কার নীরব নীল আকাশের তলে ছড়াইয়া দিতেছিল। বাদক, নর্ভকী, ভৃত্য, রক্ষক, দাসী সকলেই আমোদে মাতোয়ারা, অলস দেহগুলিকে নিজ নিজ শয্যাতে ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রিত হইয়াছিল। কুমার দম্পতি প্রমোদ-ভবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুরভিত কক্ষতলে পরস্পরের গলা ধরিয়া ঘুমাইতেছিলেন। জাগিয়াছিল কেবল আকাশে চাঁদ আর প্রমোদ-ভবনে মলয়! তাহারাই কেবল একটা ভবিষ্যৎ পুলকে অধীর হইয়া কুমার-দম্পতির শয্যার চারিদিকে আপনাদের কর্তব্য করিতেছিল।

সহসা গোপা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলেন। যেন পৃথিবী কাঁপিতেছে, আকাশ কাঁপিতেছে, বাতাস কাঁপিতেছে, গাছপালা উপাড়িয়া পড়িতেছে, চন্দ্র সূর্য্য তারা খসিতেছে। অন্ধকার—ভয়ানক অন্ধকার পৃথিবী ছাইল। সিংহাসন কাঁপিতে লাগিল, সিদ্ধার্থের মাথা হইতে রাজমুকুট খসিয়া পড়িল, রাজ বেশভূষা গেরুয়া ও বঙ্কলে পরিণত হইয়া গেল! তিনি সভয়ে আপনার গৃহের মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার পালঙ্ক শূন্য—স্বামী নাই—সিদ্ধার্থের বসন ভূষণ সমস্ত ঘরময় ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। গোপার সর্ব্বাঙ্গ মহাভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, তিনি অস্ফুট চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

নিদ্রিত স্বামীর অনিন্দ্য-সুন্দর শাস্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া গোপা যেন প্রাণ পাইলেন, ভয় কতকটা দূর হইল—একদৃষ্টে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল। তখনো রাত্রি অল্প ছিল—তিনি আবার স্বামীর গলা জড়াইয়া শুইলেন এবং নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রতিদিন ভোরের বেলা বন্দী ও বন্দিনীগণ মিলিয়া সময়ের উপযোগী রাগ-রাগিনীর আলাপে স্তুতি-গান গাহিয়া কুমার-দম্পতির ঘুম ভাঙ্গাইত। পূর্ব্বদিন অনেক রাত্রি হওয়াতে তাহারা তখনো জাগে নাই—নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছিল, কিন্তু তবু কে জানে কেমন করিয়া নিদ্রিত

প্রমোদ-ভবনে বীণার অপেক্ষা সুমিষ্ট স্বরে আলাপের ঝঙ্কার ছড়াইয়া  
কাহারা গাহিল—

উঠ জাগ আর                      ঘুমাইবে কত  
নিশি হল অবসান,  
ছাড় ঘুমঘোর                      মুছহ নয়ন  
জাগাও নবীন প্রাণ।

কুমার চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন—ধড়ফড় করিয়া চোখ মুছিতে  
মুছিতে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। উজ্জ্বল আলোক স্নান হইয়া  
ঘরের ভিতর শেষ রশ্মি ছড়াইতেছিল, খোলা জানালার পথে প্রথম  
উষার ছায়াময় আলো ঘরে ঢুকিয়া বাতির স্নান আলোর সঙ্গে মিশিয়া  
রঙ্গ করিতেছিল। প্রভাতের মন্দ বাতাস ঘুমন্ত গোপার শিথিল কবরীর  
গন্ধ চুরি করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া প্রকৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ  
তাঁহাকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের রাজা বলিয়া বন্দনা করিল।

সিদ্ধার্থ একবার চারিদিকে চাহিলেন, তখনও প্রমোদ-ভবন নীরব—  
নিস্তব্ধ, তখনো সহচরীগণ, ভৃত্যগণ, রক্ষীক্ষণ, দাসীগণ, নর্ত্তকীগণ  
সকলেই ঘুমে অচেতন,—সে অপূর্ব সঙ্গীত কে গাহিল? সে মধুর  
সঙ্গীতের মদিরতাময় মূর্ছনা সমস্ত প্রমোদ-ভবন মাতাইয়া তাঁহার  
চারিদিকে গুঞ্জন করিতেছে। কুমার সে সঙ্গীতের মোহে মুগ্ধ হইয়া  
পড়িলেন, চতুর্দিকের সকল ভুলিলেন। অতীত বর্ত্তমান ভুলিলেন  
আপনাকে ভুলিয়া গানের ভিতর তলাইয়া গেলেন। তাঁহার সেই  
ধ্যানমুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের মধ্যে অতীতের এক বিস্মৃত ছবি ফুটিয়া উঠিল।  
তখন সেই অদৃশ্য মধুর কণ্ঠ আবার গাহিল—

শোক দুঃখ পাপে      অবসন্ন ধরা  
অশান্ত অকাঙ্ক্ষা বহিয়া,  
প্রতি পলে পলে      কাঁপে হাহাকার  
নিরাশে মরমে মরিয়া—  
কে আছে কোথায়—চাহে মুখপানে  
করে কে সান্ত্বনা দান?

কোথা হতে আসে কোথা যায় চলে  
 কে দেয় সন্ধান আনিয়া,  
 ফিরে ফিরে আসে শুধু কাঁদে হাসে  
 যায় পুনঃ স্রোতে ভাসিয়া—  
 শুধু যাওয়া-আসা একটানে ভাসা  
 হবে না কি অবসান?

\* \* \*

দিন চলে গেলে মেঘ উঠে ওই  
 আঁধারে অবনী ছাইল,  
 চারিদিক হতে তরঙ্গের রাশি  
 গজ্জিয়া গ্রাসিতে আইল,  
 সঙ্গীরা ছেড়েছে—পথহারা একা—  
 কে করিবে পরিত্রাণ?

\* \* \*

কাঁদি কাঁদি কত কাতরে ডাকিছে  
 কাণে কি তোমার পশে না,  
 ভুলেতে ডুবিয়ে ভুলিয়ে রয়েছ  
 হৃদয়ে কি দাগ বসে না?  
 ধরা—হাহাকারে—প্রমোদ-বাসরে  
 আরামে লয়েছ স্থান?

\* \* \*

চপলার হাসি ঘন-আঁধারেতে  
 চকিতে যাবে যে লুকায়ে,  
 কুসুম শুকাবে জরা বিনাশিবে  
 পরমায়ু যাবে ফুরায়ে,  
 দু দিনের খেলা—এ ভবের বেলা  
 করে দিবে অবসান!

\* \* \*

চেতন যে ছিলে, কেন হে ঘুমালে,  
 মুখ চেয়ে ধরা পড়িয়া,—  
 কয় তমঃ নাশ হও সুপ্রকাশ  
 মোহ-ঘুমঘোর ভাসিয়া,  
 স্বপন ছুটিয়ে আঁধার নাশিয়ে  
 কর নব প্রাণদান!

\* \* \*

পূরব গগনে নব উষা ওই  
 পলায় অঁধার ত্বরিতে  
 ছিঁড়ে ফেল জাল আইল সকাল  
 উঠ উঠ দ্রুত গতিতে?  
 জয় জয় রবে আনন্দ উৎসবে  
 কর সঞ্জীবনী দান।

গান থামিল, রাত্রি পোহাইল, কিন্তু কুমারের তন্ময়তা ঘুচিল না—  
 তখনো, সেইভাবে তেমনি বসিয়া বিভোর হইয়া রহিলেন। তাঁহার  
 ধ্যান-মুগ্ধ-হৃদয়ে অতীতের প্রতি স্মৃতি—প্রতি কথা নূতন প্রাণে জাগিয়া  
 খেলা করিতে লাগিল। তিনি হারানো পথ আবার দেখিতে  
 পাইলেন।

পাখীর ডাকেও নহবতের ধ্বনিতে প্রমোদ-ভবনের সকলের ঘুম  
 ভাঙ্গিয়া গেল, সকলে তাড়াতাড়ি সাজিয়া-গুজিয়া বন্দনা-গীত আরম্ভ  
 করিল। গোপা চমকিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

সিদ্ধার্থের ধ্যানমুগ্ধ জড়ের মত মূর্তি দেখিয়া তিনি অধিকতর চমকিত  
 হইলেন, রাত্রের ভীষণ স্বপ্নের প্রত্যেক ব্যাপার মনে পড়িল, তাঁহার প্রাণ  
 থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি গলবস্ত্র হইয়া পতি-  
 দেবতার চরণে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া গোপা তাঁহার কণ্ঠ-আলিঙ্গন  
 করিলেন। সেই শক্তিময়ী প্রকৃতির স্পর্শের বিদ্যুৎ প্রবাহে কুমারের ধ্যান  
 ভাঙ্গিয়া গেল।

ধ্যান ভাঙ্গিল কিন্তু জ্ঞান ফিরিল না, চক্ষু চাহিলেন কিন্তু গোপাকে দেখিয়াও যেন চিনিতে পারিলেন না—তখনো তাঁহার প্রাণে প্রাণে সেই অপূর্ব সঙ্গীতের মোহময় বন্ধার খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

স্বামীর এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া গোপা কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেই চক্ষের জলধারায় কি তেজোময়ী বিদ্যুৎ-শিখা সঞ্চারিত ছিল সহসা কঠোর আঘাতে সিদ্ধার্থের জীবন-স্রোত বহাইয়া দিল। তিনি গোপার পানে একবার বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া, আদর করিয়া মুখচুম্বন পূর্বক সে অশ্রুধারার গতি রোধ করিলেন।

গোপার ধড়ে প্রাণ ফিরিল। তিনি একে একে আপনার স্বপ্নের কথা জানাইলেন, তারপর তাঁহার সেইরূপ ভাবান্তরের কথা তুলিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সিদ্ধার্থ আবার মধুর হাসিয়া পত্নীর মুখচুম্বন করিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

“শুন প্রিয়ে এ কারাবাসে আর আমার মন বসিতে চাহেনা, কি করিতে আসিয়া কি কাজে বৃথায় অমূল্য দিনগুলি কাটাইতেছি দেখ। আমরা প্রমোদ-ভবনের ভিতরে সুখ পালিত পাখীর মত আবদ্ধ থাকিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইতেছি, কিন্তু বাহিরে পৃথিবী জুড়িয়া দিবারাত্রি রোদনের ধ্বনি উঠিতেছে! রোগ, শোক, সন্তাপে পৃথিবী জর্জরিত—হাহাকারের উপর হাহাকার উঠিয়া আকাশ ছাইতেছে। এ দুঃখ আর আমার প্রাণে সহ্যে না। তুমি যদি সম্মতি দাও—তুমি যদি সহায় হও, তবে সেই প্রেম-বলে বলীয়ান হইয়া আমি এ দুঃখ নিবারণ করিব।”

গোপা শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## সংকল্প

সিদ্ধার্থ বুঝিতে পারিলেন যে তিনি দিন দিন ঘোরতর সংসারী হইয়া পড়িতেছেন, মায়াজালে ক্রমেই অধিকতর জড়িত হইতেছেন—যে অনিত্য আমোদ-প্রমোদকে তিনি ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন অহোরাত্রের ইষ্টমন্ত্র হইয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণা সকল ঘুচাইয়া দিতে বসিয়াছে সুতরাং সময় থাকিতে এইবেলা এ বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে।

পৃথিবী মহা দুঃখের অনন্ত-পারাবার। এখানে জীব কোথা হইতে আসিতেছে এবং কোথায় চলিয়া যাইতেছে তাহা কেহই জানে না—কেবল আনাগোনা চলিয়াছে। এই আনাগোনার মধ্যে কেবল অবিচ্ছেদ দুঃখ—অশ্রান্ত ক্রন্দন—নিরন্তর অশান্তি ও দিবারাত্রি মর্ম্মভেদী হাহাকার একই ভাবে আকাশ কাঁপাইতেছে। ইহার বিরাম কোথায়, ইহার প্রতিকারের ঔষধ কি?

এ সংসারের সকলই অনিত্য—কিছুই স্থায়ী নহে, কিছুই সত্য নহে, জলবুদবুদের মত ফুটিয়া উঠিয়া তখনই লয় পায়। সেই এতটুকু সময়ের জন্য—পরমায়ু, তাও আবার শোকদুঃখে জঞ্জরিত। তবে মানুষ এই ভঙ্গুর শরীরের ভোগ-বিলাসের জন্য লালসায় পাগল হইয়া উঠে কেন? যা মিথ্যা—যা অনিত্য—যা ভঙ্গুর, তার মাঝে কোথা হইতে যথার্থ সুখ শাস্তি মিলিবে?

তবে কি সুখ শাস্তি নাই, সংসার-রচনা কেবল কি পাগলের মাথার শুষ্ক লক্ষ্যশূন্য কার্য্য ? না—এই অনিত্যের মধ্যে নিশ্চয়ই এক নিত্য বস্তু আছে, এই অশান্তিময় বিশ্বসংসারের মধ্যে এক শান্তির উৎস আছে এই অবিশ্রাম শোক-দুঃখ-ক্রন্দন ও হাহাকারের রাজ্যের ভিতরেও চিরসুখময়—চিরহাস্যময়—চিরআনন্দের রাজ্য আছে, সেই—সত্য—সেই ধ্রুব—সেই—নিত্য।

তাহার সন্ধান পাইলেই মানুষ যথার্থ সুখ ও শান্তিলাভ করিতে



পারে। সেই নিত্যবস্তুর সন্ধান করিতে হইবে, পাইলে তাহা মানবগণকে বিতরণ করিয়া সকলের শোক, দুঃখ ও সন্তাপভার লাঘব করিতে হইবে। যে নিজে অন্ধ, সে অপরকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? যে নিজে মুক্তি পায় নাই, সে পরকে মুক্ত করিবে কিরূপে? সুতরাং আগে আপনাকে পথ সন্ধান করিয়া চিনিয়া লইতে হইবে— আপনাকে মুক্ত করিতে হইবে। নিজে মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিতে হইবে।

সিদ্ধার্থ আবার সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে ধ্যানমগ্ন হইলেন। যতই নিত্য নিত্য ধ্যানের গভীরতা বাড়িতে লাগিল, ততই সংসারের মোহ-পাশ এক এক করিয়া ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, ততই চক্ষের সন্মুখে জ্ঞানের আলো ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। তিনি দিন দিন অধিকতর গভীর ভাবে চিন্তা-সাগরে ডুবিতে লাগিলেন।

পুনরায় পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া রাজা আবার শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু উপায় কি? মানুষের যতদূর সাধ্য—পুত্রকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, তিনি তাহা করিয়াছেন—আর উপায় কি? তিনি আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া বিষম চিন্তিত হইলেন।

স্বামীকে সর্বদা এইরূপ চিন্তিত—উদাসীন ও ধ্যানমগ্ন দেখিয়া গোপারও বড় ভয়-ভাবনা হইল, তিনি বিধিমত উপায়ে স্বামীর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাধবী সহধর্মিণী তাঁহার ধর্মপথের বিঘ্ন-কারিণী হইতে পারিলেন না।

স্বামীর হৃদয় বিশ্বের শোক-দুঃখে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি সেই শোক-সন্তাপ দূর করিবার জন্য মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—সহধর্মিণী হইয়া কেমন করিয়া তিনি এই মহাব্রতে বাধা জন্মাইবেন? না— তাহা হইবে না। তিনি বরং তাঁর ধর্মপথে সহচারিণী হইয়া তাঁহার মহাব্রত উদ্‌যাপনে সহায়তা করিবেন। নহিলে সহধর্মিণী হইয়াছেন কেন?

এইরূপ অবস্থায় সকলের দিন কাটিতে লাগিল। তখন আর এক ঘটনা ঘটিল।

সেদিন সিদ্ধার্থ নগর-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, ‘ছন্দক’ সারথি রথ চালাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিস্তর লোক চলিয়াছে। হঠাৎ পথের মধ্যে কুমার দেখিলেন—এক অতি কৃশ খর্ব্বাকার ব্যক্তি জরাগ্রস্ত—বার্দ্ধক্য পীড়িত হইয়া অতি কষ্টে লাঠির উপর ভর দিয়া যাইতেছে। পদে পদে টলিতেছে—হস্ত, পদ, শরীরে বল নাই—মনে হইতেছে এইবার বুঝি পড়িয়া গেল?

এই দৃশ্য দেখিয়া কুমার চমকিয়া উঠিলেন, সারথিকে কহিলেন—  
“দেখ, দেখ, ওই খর্ব্বাকৃতি অতি দুর্বল পুরুষটি কে? শরীরের সমস্ত মাংস শুষ্ক, চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, শিরা সকল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু যেন দেখিতে পায় না, দাঁত নাই, চুল সাদা, গায়ে-পায়ে জোর নাই—লাঠিতে ভর করিয়া অতি কষ্টে টলিতে টলিতে চলিয়াছে। আহা, কে ওই ব্যক্তি—কেন এমন দশা?”

সারথি কহিল—“ঐ ব্যক্তি জরাগ্রস্ত, বৃদ্ধ হইয়া শক্তি হারাইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, আর কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই—শিশুর মত নিতান্ত দুর্বল ও অশক্ত হইয়া অসহায় হইয়াছে, বন্ধু-বান্ধব সকলে ত্যাগ করিয়াছে—কাজেই অতি কষ্টে কোনমতে জীবনের দিন কয়টা কাটাইতেছে।”

সিদ্ধার্থ সারথির কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা, এই দশা কি ঐ ব্যক্তির কুলের ধর্ম্ম অনুসারে ঘটিয়াছে না জগতের প্রত্যেক জীবই এই দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে?”

সারথি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত চিত্তে কহিল—“হায় কুমার, এ দশা উহার একার নয়, সমস্ত জগতেরই এই দশা ঘটিয়া থাকে। বাল্যের পর যেমন যৌবন আসে, যৌবনের পর তেমনি বার্দ্ধক্য আসিয়া মানুষকে জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলে—ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধান। প্রাণী দেহ ধরিলেই কালে একদিন না একদিন জরাগ্রস্ত হইতে হইবে, কি রাজা, কি প্রজা—কি ধনী কি নির্ধন—কেহই এ নিয়ম ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। আপনি, আমি, আমাদের পিতা-মাতা-সহধর্ম্মিণী-বন্ধু-

বান্ধব, জ্ঞাতিস্বজন, দাস-দাসী সকলকেই এক সময়ে জরা আসিয়া ধরিবে—কাহারও নিষ্কৃতি নাই।”

কুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—‘এই ছার অনিত্য দেহের জন্য এত ভোগ-বিলাসের কামনা—ছি ছি—ধিক্? রথ ফিরাও আর আমার ভ্রমণে ইচ্ছা নাই।’

সেদিন আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না। কুমার ফিরিয়া আসিয়া ধ্যানে বসিলেন।

তারপরে আবার যেদিন বেড়াইতে বাহির হইলেন—সেদিন আর এক দৃশ্য তাঁহাদের চক্ষে পড়িল। এক ব্যক্তি—সর্ব্বাঙ্গ বিবর্ণ—বিকট মূর্ত্তি—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পথে চলিয়াছে। তাহার চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে—গাল অত্যন্ত বসিয়া গিয়াছে—মুখ শুষ্ক, বিরস—চুল রুম্ম, সর্ব্বাঙ্গে মলমূত্রের দাগ লাগিয়া আছে, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিতেছে আর দারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাঁদিতেছে। দেখিয়া সিদ্ধার্থের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। তিনি ছন্দক সারথিকে সেই ব্যক্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ছন্দক কহিল—“এ ব্যক্তি পীড়িত, ব্যাধিগ্রস্ত রুগ্ন, ইহার মৃত্যু নিকট। আর আরোগ্যের আশা নাই—দেহ হইতে সমস্ত তেজবীৰ্য্য গিয়াছে,—ইহার আর পরিত্রাণ নাই, শীঘ্রই মৃত্যু হইবে। পীড়ার যাতনা সহিতে না পারিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে কাঁদিতেছে।”

“এ দশা কি উহার একার, না আমাদের সকলেরই ঐ দশা ঘটিবে?”

“হায় কুমার, এদশা মানব মাত্রেরই। দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। সে যতই কেন সাবধানে থাকুক না—শেষ সময়ে তাহাকে দুরারোগ্য ব্যাধি আসিয়া ধরিবেই ধরিবে, ব্যাধির যাতনা দুঃসহ—ভয়ানক, কাহারও এড়াইবার উপায় নাই।”

“ধিক্, ধিক্—মানুষের ভ্রান্তবুদ্ধিকে শত ধিক্। সকলেই ভাবে—তাহার সুস্থ দেহ, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া কখন

যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি আক্রমণ করিবে তা একবার ভাবিয়াও দেখে না। কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি মানব-দেহের এই অবস্থা ভাবিয়া ও নিত্য চক্ষু দেখিয়া, নিশ্চিন্তে আমোদ-আহ্লাদ করিতে পারে?”

সেদিনও তাঁহার আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না, গৃহে ফিরিয়া ধ্যানের গভীরতা আরও বাড়িয়া গেল।

আবার একদিন ঐরূপে ভ্রমণে বাহির হইয়া সিদ্ধার্থ পথে এক শবদেহ দেখিতে পাইলেন—আত্মীয় স্বজনেরা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্মশানে লইয়া যাইতেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি সারথিকে উহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সারথি কহিল—“ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে—এই পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ফুরাইয়াছে, তাই উহার আত্মীয়স্বজনগণ উহাকে চিরবিদায় দিতে কাতর হইয়া হাহাকারে কাঁদিতেছে?”

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিদ্ধার্থ কহিলেন—“যে যৌবনকে জরা গ্রাস করিয়া সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দেয়—সে যৌবনকে ধিক্, যে স্বাস্থ্যকে নিমেষে নষ্ট করিয়া ব্যাধি আসিয়া চাপিয়া ধরে—সে স্বাস্থ্যকে ধিক্, আর যে জীবনকে মৃত্যু আসিয়া বিলয় করিয়া দেয়—সে জীবনকেও ধিক্! ইহাদের সকলই অসার, অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর—পায়ে পায়ে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু গ্রাস করিতে আসিতেছে। ইহার কি উপায় নাই? রথ ফিরাও—মানবের মহাদুঃখের কারণ কি জানিয়াছি, এখন মুক্তির উপায় ভাল করিয়া চিন্তা করিব।”

আর যাওয়া হইল না, গৃহে ফিরিয়া রাজপুত্র সেদিন এমন গভীর ধ্যানে বসিলেন—সে ধ্যান সহজে ভাঙ্গিল না। যখন ভাঙ্গিল তখন তাঁহার কর্তব্য অবধারিত হইয়া গিয়াছে।

শেষদিন রাজপথে বাহির হইয়াই কুমার প্রশান্ত বদন, সৌম্যমূর্তি, পরম নম্র, গভীর, উদার, আনন্দময় এক ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। তাহার বদনমণ্ডলে শান্তির অগ্নি ছায়া তাহাকে পরম শোভাময় সৌন্দর্য্যবান করিয়া তুলিয়াছিল। দেখিবামাত্র কুমারের হৃদয়ে এক

অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইল। সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“এ মহাপুরুষ কে?”

সারথি কহিল—“ইনি সন্ন্যাসী, সকল বাসনা বর্জনপূর্বক সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি রিপুজয়ী মহাপুরুষ—জগৎকে আপনার জ্ঞান করিয়া বিশ্বের হিত-কামনায় মগ্ন হইয়াছেন। ইহার নিজের কিছুই নাই—সারা বিশ্বের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া বিশ্ব-প্রাণ হইয়াছেন, ভিক্ষায়ে জীবন-যাপন করিতেছেন।”

কুমার আনন্দে বিহ্বল হইয়া ‘ধন্য ধন্য’ করিয়া উঠিলেন,—স্থির করিলেন—অবিলম্বে এই পথ গ্রহণ করিয়া জগতের সস্তাপ দূর করতঃ বিশ্বের পরম হিত সাধন করিবেন।

## নবম পরিচ্ছেদ

### গৃহ-ত্যাগ

জলের ঢল একবার নামিলে আর ফিরে না, সিদ্ধার্থের সংকল্পও সেইরূপ, কেহ তাঁহাকে সে সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না। তবু সংকল্প প্রতিপালনে বিস্তর বাধা বিঘ্ন অলঙ্ঘ্যনীয় প্রাচীরের মত সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে—তিনি কেমন করিয়া সে প্রাচীরের বাধা উত্তীর্ণ হইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ পুত্রগতপ্রাণ রাজা শুদ্ধোদন কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিবেন না। একান্ত পিতৃবৎসল পুত্র পরম স্নেহবান পরম করুণাময় পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সেই পিতার হৃদয়ে শেলাঘাত করিয়া কোন্ প্রাণে বাহির হইবেন? সংসারে একমাত্র পিতাই যে ধর্ম, স্বর্গ, তপ-জপ-সাধনা—পিতা সন্তুষ্ট থাকিলে, সকল দেবতাই সন্তুষ্ট হন। সেই পিতৃ-অনুমতি না পাইলে, সেই পিতার প্রাণে আঘাত দিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কেন? তিনি যখন আপনার আদর্শ দেখাইয়া সংসারকে শিক্ষা দিতে উৎসুক, তখন তাঁহার এই প্রথম কার্যেই

যে লোকের অন্তরে কু-নীতির বীজ রোপণ করা হইবে। সন্তান পিতৃভক্তি হারাইলে সংসার হইতে যে চিরকালের জন্য ধর্মের নাম পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইবে—উপায় কি?

তার উপর দ্বিতীয় বাধা—জননী গৌতমী। সিদ্ধার্থ তাঁহার গর্ভজাত নহেন সত্য, কিন্তু গর্ভধারিণী হইতেও যে তিনি সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কুমার যে তাঁহার নয়নের আলো—বুকের ধন—দেহের জীবন। একদণ্ড তাঁহাকে না দেখিলে যে জননী অধীর হইয়া উঠেন, সংসার শূন্য জ্ঞান করেন, পাগলিনীর মত ছটফট করিতে করিতে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ান, সেই জননীর মনে কষ্ট দিয়া—তাঁহাকে চোখের জলে ভাসাইয়া তিনি কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে বিদায় লইবেন? তাঁহার চক্ষের প্রতিবিন্দু জল যে তাঁহার ধর্মাচরণের পথে শেল বিদ্ধ করিবে, তাঁহার প্রত্যেক বুকফাটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সে জ্বলন্ত আগুনের প্রচণ্ড তাপে তাঁহার চারিদিক জ্বলাইয়া দিবে—তাহার উপায় কি?

তৃতীয় বাধা—প্রিয়তমা সহধর্মিণী গোপা। যে গোপা সমস্ত কায়মনোপ্রাণ অর্পণ করিয়া ক্ষীণ লতাটির মত তাঁহাকেই জড়াইয়া বাঁচিতেছে, তিনি কেমন করিয়া তাহার সেই আশ্রয় তরুটিকে উপাড়িয়া ফেলিবেন? যে গোপা একদিনের জন্যও কখনো অভিমান করে নাই, একটি মাত্র কঠোর কথা কহে নাই, কখনো তাঁহার ক্ষুদ্র ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে নাই—তাহাকে তিনি কেমন করিয়া কাঁদাইবেন, তিনি যে তাঁহার জীবনের অবলম্বন—সে অবলম্বন কাড়িয়া লইলে সে লতাটি কি আর একদিনও বাঁচিবে? শেষে কি তিনি নারীহত্যা, পত্নীহত্যা করিবেন?

কিন্তু এদিকে যে নিত্যই জীবনভার দুর্ভিসহ হইয়া উঠিতেছে। চক্ষের উপর ধর্মের বেশ পরিয়া অধর্ম চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে; অহোরাত্র পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বুকফাটা রোদন রোল উঠিয়া ভূমিকম্পের মত কাঁপাইতেছে, কোটী কোটী নর-নারী

দারুণ যন্ত্রণানলে দন্ধ হইয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছে। কে তাহাদের মুখ চায়—কে তাহাদের দুঃখ ভাবে—কে তাহাদের রক্ষা করে?

সমস্ত দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ না করিলে কেহ পরোপকার করিতে পারে না—আমার আমিষ পরের ভিতরে ডুবাইয়া না দিতে পারিলে পরসেবা হয় না—সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ না করিলে দেশব্যাপী অধর্ম ও দুঃখের হস্ত হইতে কেহ মনুষ্যকে রক্ষা করিতে পারে না। পরের জন্য এত ত্যাগ-স্বীকার কে করিবে? সমস্ত দেশবাসীর স্বার্থের কাছে নিজের স্বার্থ কতটুকু? সমস্ত মানবজাতির মহা প্রয়োজনের কাছে নিজের প্রয়োজন কত ক্ষুদ্র? সমস্ত জগতের উচ্চকর্তব্যের কাছে নিজের জীবনের ক্ষুদ্র কর্তব্য কত তুচ্ছ?

সিদ্ধার্থ ভাবিয়াছিলেন যে সংসারে থাকিয়া ধর্মপালন করিবেন, আপনার ক্ষুদ্র-গম্ভীর ভিতরে বদ্ধ থাকিয়া জগতের মহাকার্য সাধিবেন, এখন দেখিলেন—তাহা অসম্ভব। ধর্মের জন্য পাগল হইয়া বাহির না হইলে ধর্মবিহীন মানবকে ধর্মপথে আনিতে পারিবেন না। পরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া দ্বারে দ্বারে না ফিরিলে পরকে বাধ্য করিয়া তাহাদিগকে মহাপথে লইয়া যাইতে পারিবেন না। সুতরাং সমস্ত জগতের শোক দুঃখ পাপ তাপ নিবারণের জন্য, সমস্ত জগতকে পবিত্র উজ্জ্বল শান্তিপূর্ণ ও সুখময় করিবার জন্য—সেই মহাযজ্ঞে আপনার ক্ষুদ্র সুখ, শান্তি কর্তব্য সমস্ত আহুতি দিলেন।

সিদ্ধার্থ যখন মনে মনে এইসব আলোচনা করিয়া আপনার গম্ভীর পথে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময়ে সংবাদ আসিল যে প্রমোদ-ভবনে গোপা একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া তিনি ভাবিলেন যে—বন্ধনের উপরে আবার নূতন বন্ধন উপস্থিত হইল। যে বন্ধন ছিঁড়িবার জন্য তিনি নিয়ত আকুল প্রাণে অধীর হইয়া চেষ্টা করিতেছেন, সেই বন্ধন আরো নানা প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আর এক মুহূর্তও বিলম্ব করা উচিত নহে।  
গৌতম—৪

যাই যাই করিয়া দেৱী করিলে—কে জানে, হয়ত বা—আরো কত রকম নূতন বন্ধন উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয়ে দৃঢ় শৃঙ্খল পরাইয়া দিবে। তখন আর বাহির হইবার শক্তি থাকিবে না। সংকার্য্যে অশেষ বিঘ্ন। ইচ্ছামাত্র কার্য্য না করিলে শুধু চিন্তাদ্বারা সে কার্য্য সম্ভব নহে। সুতরাং তিনি আর কাল বিলম্ব করিবেন না।

মনে মনে কর্তব্য স্থির করিয়া সেই দিনই তিনি পিতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন। রাজ পুত্রের কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে মূর্ছিত হইলেন। সিদ্ধার্থ অনেক করিয়া তাঁহার মূর্ছা দূর করিলেন।

রাজা তখন অশেষ প্রকারে বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিলাপে কুমারের দুই চক্ষের জল গড়াইয়া বুক ভাসাইতে লাগিল, তথাপি মনে মনে তিনি অচল অটল রহিলেন।

শেষে রাজা কহিলেন—“তুমি সংসারত্যাগী হইওনা, আমি সে অনুমতি দিতে পারিব না, তা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমার প্রাণ যাইবে। তোমার কিসের অভাব খুলিয়া বল, যা চাও তাই দিব, ও সংকল্প মন হইতে দূর করিয়া দাও।”

সিদ্ধার্থ কহিলেন—“বেশ, আমাকে চারটি বর দিন। যদি আমাকে এই চারটি বর দিতে পারেন, আমি গৃহে থাকিব, নইলে আমার সংসারে থাকিবার উপায় নাই।”

“বেশ, চারটি কেন—যা ইচ্ছা বল, যা চাহিবে তৎক্ষণাৎ দিব, যদি না দিতে পারি, তখন গৃহত্যাগ করিও। তোমাকে সুখী করিবার জন্য আমার কিছুই অদেয় নাই।”

সিদ্ধার্থ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন “আমাকে এই ভিক্ষা দিন—যেন, জরা আসিয়া কখনো আমাকে আক্রমণ না করে, আমার যৌবন যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে—কখনো যেন বৃদ্ধ না হই, চিরকাল যেন সুস্থ শরীরে থাকিতে পারি—কোন রকম পীড়া যেন না হয়, আর আমার পরমায়ু যেন অফুরন্ত হয়—কখনো যেন মৃত্যু আমার কাছে



আসিতে না পারে। আমি অনন্তকাল সুস্থ দেহে, যুবক হইয়া যেন অমর হইয়া থাকি, এই তিনটি বর দিন। আমি গৃহ ছাড়িয়া যাইব না।”

পুত্রের কথা শুনিয়া রাজার চক্ষু কপালে উঠিল, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে পুত্র এরূপ অসম্ভব বস্তু চাহিবে। অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিলেন—“বাছা, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই, আমার কেন—কাহারওই নাই। চিরতপস্বী পরম পুণ্যবান মুনিঋষিগণও ইহার হস্ত ঞ্ড়াইতে পারেন না—আমি কোন্ হার?”

“তবে আমায় আর একটি বর দিন—পুত্রস্নেহ ছিন্ন করুন, যাহাতে জগতের দুঃখ দূর করিতে পারি—সেই কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। যদি আপনার আশীর্ব্বাদে সে রত্ন লাভ করিতে পারি—আপনাকে সর্ব্বাগ্রে সে ধন আনিয়া দিব।”

রাজার বুক ফাটিতে লাগিল, কিন্তু পরম ধার্মিক পিতা, পুত্রের ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথে আর বাধা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। সেই দারুণ শোকের মধ্যেও পুত্রের গৌরবে তাঁহার অন্তঃকরণ নাচিয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিলেন। সিদ্ধার্থ পরম আনন্দে অন্তঃপুরে বিদায় লইতে চলিলেন।

প্রমোদ ভবনে প্রবেশ করিবামাত্রই এক বীভৎস দৃশ্য তাঁহার চক্ষে পড়িল। যে সকল অঙ্গরার ন্যায় সুন্দরী যুবতীর দল তাঁহার অন্তরে হাব-ভাবনৃত্যগীতে বিলাস-বাসনা বাড়াইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই নিদ্রিত। কেহ উলঙ্গ, কেহ অর্দ্ধনগ্ন, কাহারও নাসিকা ঘোর রবে গর্জ্জন করিয়া কীট-পতঙ্গেরও ভীতিসঞ্চার করিতেছে, কাহারও মুখ দিয়া লালা পড়িয়া বিছানা ভাসাইতেছে, কেহ বিকট-ভঙ্গীতে দাঁত কিড়মিড় করিতেছে। অমন যে সুন্দরীর দল যেন কোন মন্ত্র প্রভাবে ডাকিনী অপেক্ষাও কুৎসিৎ দেখাইতেছে। এই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখিয়া কুমারের মনে মানব-শরীরের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল—ভোগ-বিলাসকে ন্যাকারজনক ভিন্য অন্য কিছু ভাবিতে পারিলেন না।

তাহার পর তাহাদের দশা দেখিয়া মনে অত্যন্ত করুণার সঞ্চার হইল। বলির জন্য উৎসর্গীকৃত পশুর মত ইহারাও ইন্দ্রিয়-পাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—হায় ইহাদের জীবনের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর? কে ইহাদের এ দুর্দশা মোচন করিবে? তাহার দুই গণ্ড ভাসাইয়া অশ্রু বহিল। তিনি সেখান হইতে ধীরে ধীরে গোপার গৃহে গমন করিলেন।

নিদ্রিত পত্নী ও নবজাত পুত্রের কাছে নীরবে বিদায় লইয়া প্রমোদ-ভবনের বাহিরে আসিলেন। দ্বারে ছন্দক সারথি দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, তিনি তাহাকে রথ আনিতে কহিলেন।

ছন্দক তাহার পদতলে গড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল, তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত করিলেন। ছন্দক রথ সাজাইয়া আনিল।

সিদ্ধার্থ সেই রাত্রে সুখের সংসার, সুখের গৃহবাস, সুখের প্রমোদাগার ছাড়িয়া তপস্যা করিবার জন্য সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলেন।

## দশম পরিচ্ছেদ

### সাধনা

ছন্দক ফিরিয়া আসিয়া যখন কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা কহিল এবং সিদ্ধার্থের রাজ্য বসন-ভূষণ সমস্তই এক এক করিয়া বুঝাইয়া দিল, তখন রাজপুরীর মধ্যে প্রলয় শোকের হাহাকার উঠিল। রাজা মূর্ছিত হইলেন, রাণী মূর্ছিত হইলেন, গোপা পাগলিনীর মত ধূলায় লুটাইতে লাগিল, পুরবাসী ও বাসিনীগণ আর্তনাদ করিতে করিতে শিরে করাঘাত করিতে আরম্ভ করিল—কে কাকে দেখে? কে কাকে সাঙ্গনা দেয়? অমন সদানন্দময় কপিলবাস্তু নগর শোক দুঃখের আকর হইয়া উঠিল।

অনেক কষ্টে প্রথমে শোকের বেগ সম্বরণ করিয়া রাজা শুদ্ধোদন প্রথমে মন বাঁধিলেন, সকলকে বুঝাইয়া কহিলেন—“আমরা বড়

ভাগ্যবান যে এমন পুত্ররত্ন পাইয়াছি। কোটি কোটি জন্ম তপস্যা করিলেও এরূপ সন্তান মিলে না। পুত্র আমাদের ধর্মের অবতারণ। আমরা মিথ্যা মায়ায় আবদ্ধ হইয়া তাহার উচ্চকার্যে বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাই স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশে আসিয়া তাহার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। নহিলে দিবানিশি মহা সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও রাজপুরীতে জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, মৃত এবং ভিক্ষুক আসিল কেমন করিয়া? আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, এ তাঁহারই খেলা। দৈবজ্ঞেরা যথার্থ বলিয়াছিলেন—সিদ্ধার্থ মহাপুরুষ, তাঁহার জন্মে আমার বংশ পবিত্র, পৃথিবী পবিত্র হইয়াছে। তোমরা আর কেহ শোক করিও না, যাহাতে কুমার আমার সত্ত্বর সিদ্ধিলাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আসে তাহার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর।”

রাজার বাক্যে সকলে শান্ত হইল কিন্তু গোপা কিছুতেই মনকে বুঝাইতে পারিল না। তাহার স্বামী সন্ন্যাসী, সে সহধর্মিণী, তাঁহার ধর্মকার্যের অংশভাগী—সুতরাং রাজবধূও সমস্ত বসন ভূষণ ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী সাজিল, একবস্ত্রে ধূলিশয্যায় থাকিয়া ব্রহ্মচার্য্য পালন করিতে লাগিল। তাহাকে যৌবনে যোগিনী সাজিতে দেখিয়া সকলের বুক ফাটিতে লাগিল—গাছপালা পশুপক্ষী পর্য্যন্ত যেন দুঃখে মৃতপ্রায় হইল, কিন্তু কেহই সাহসপূর্ব্বক মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না।

এদিকে ‘অনোমা’ তীর হইতে ছন্দককে বিদায় দিয়া সিদ্ধার্থ সাতদিন পর্য্যন্ত ‘অনুগ্রিয়’ নামক আশ্রয়স্থানে রহিলেন, তারপরে সেখান হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্ব্বদিক অভিমুখে চলিয়া ‘বৈশালী’ নগরে উপস্থিত হইলেন।

বৈশালী নগরে ‘অরাঢ়কালাম’ নামে এক পণ্ডিত বাস করিতেন, তিনশত শিষ্য তাঁহার কাছে শাস্ত্র পড়িত। সিদ্ধার্থের নবীন বয়স এবং অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বহু সমাদরে আপনার আশ্রমে রাখিলেন। রাজপুত্র সেইখানে থাকিয়া সেই পণ্ডিতের কাছে দর্শন শাস্ত্র এবং ধ্যান শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত শক্তিবলে অতি অল্পকাল মধ্যে তিনি অরাঢ়-কালামের সমস্ত বিদ্যা শিখিয়া ফেলিলেন, সকলেই স্তুতিত হইয়া গেল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মনের পিপাসা মিটিল না—যাঁহা খুঁজিতে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের ভিতরে তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন সেখান হইতে বিদায় লইয়া ‘রাজগৃহ’ অভিমুখে চলিলেন।

রাজগৃহ—মগধের রাজধানী—বিশ্বিসার সেখানকার রাজা। পাঁচটি ছোট ছোট পাহাড় সেই নগরকে বেষ্টিত করিয়া দেবমন্দিরের মত—তাহার শোভা বাড়াইত। সেই সকল পাহাড়ের গুহার মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাহাদের একটির নাম পাণ্ডব-শৈল।

সিদ্ধার্থ সেই পাণ্ডব শৈলের একটি নিৰ্জ্জন গহ্বরের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

দিবসে তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে রাজগৃহ নগরীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অপরূপ রূপ-লাবণ্য দেখিয়া নগরীর মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে সে মূর্তি দেখিল—সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। শীঘ্রই রাজার কানে সেই অপূৰ্ব সন্ন্যাসীর কথা পৌঁছিল। রাজা স্বয়ং পাণ্ডব-শৈলে নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিলেন এবং পরিচয় পাইয়া আপনার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানপূর্বক তাঁহাকে সেইখানে বাস করাইবার চেষ্টা পাইলেন। সিদ্ধার্থ তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইয়া নিরস্ত করিলেন।

একটি পাহাড়ের গুহায় ‘রুদ্রক রামপুত্র’ নামে এক ঋষি সাতশত শিষ্য লইয়া বাস করিতেন। তিনি সেই ঋষির শিষ্য হইয়া হিন্দুশাস্ত্র সকল এবং যোগ-প্রণালী শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প-কালেই গুরুর সমান সমান হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না—যাহা চান, তাহা পাইলেন না।

তিনি ভাবিলেন যে, কেবল শাস্ত্র পাঠদ্বারা জ্ঞানোপার্জন এবং পাপকার্য্য হইতে বিরত হইলেই চরম বস্তু পাওয়া যায় না। মন হইতে ইচ্ছা ও আসক্তির মূল পর্য্যন্ত উপাড়িয়া ফেলিতে হইবে, শরীর ও মনকে এমনভাবে নিপীড়িত করিতে হইবে যে যাহাতে ইচ্ছা ও

আসক্তির ভাব পর্য্যন্ত না আসিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয় বিজয়, ইচ্ছা ও আসক্তির মূলোৎপাটন, সং বিষয়ের ধ্যান, মনের ঐকান্তিকতা সাধন অগ্রে প্রয়োজন। এই সকলের জন্য কঠোর তপস্যা দ্বারা চেষ্টা করিতে হইবে।

এই ভাবিয়া তিনি সেস্থান ছাড়িয়া নৈরঞ্জনা নদী তীরে ‘উরুবিল্ব’ গ্রামে আসিলেন! সেই গ্রামে কোণাণ্য প্রভৃতি পাঁচজন ব্রাহ্মণ পূর্ব হইতেই সংসার ছাড়িয়া তাঁহার অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা আসিয়া সিদ্ধার্থের সঙ্গে মিলিলেন এবং শিষ্যভাবে তাঁহার অনুগত হইয়া রহিলেন।

‘উরুবিল্ব’ গ্রামখানিকে গ্রাম না বলিয়া রমণীয় তপোবন বলিলেও হয়। সে স্থানের প্রাকৃতিক শোভা বড় চমৎকার—মনে ধর্ম্মভাব আপনা হইতেই জাগিয়া উঠে। সিদ্ধার্থ সেই স্থানে প্রথম তপস্যা আরম্ভ করিলেন।

প্রথমতঃ তিনি ভূমিতলে বসিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া যোগ-ধ্যান আরম্ভ করিলেন। দিন দিন চেষ্টার দ্বারা সেই শক্তি যতই বাড়িতে লাগিল ততই ক্রমে শ্বাসকার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া গেল—দেহের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ হইয়া রহিল। তাহার ফলে দারুণ শীতে, দুর্জ্জ্বল হিমের মধ্যেও তিনি এমন ঘামিতে লাগিলেন যে সেই ঘাম জলের স্রোতের মত তাঁহার দেহ হইতে বাহির হইয়া মাটি ভিজাইল এবং পরে বাষ্প হইয়া শূন্যে মিলাইতে লাগিল।

তখন শরীরের ভিতরকার সেই আবদ্ধ বাতাস অন্য পথ না পাইয়া দুই কানের ভিতর দিয়া মহাশব্দে বাহির হইবার চেষ্টা পাইল। তিনি তখন চেষ্টা বলে তাহাও বন্ধ করিলেন। তখন বাতাস উপর দিকে উঠিয়া মস্তকে ও ললাটে অত্যন্ত আঘাত করিতে লাগিল।

তবুও সাধনার বিরাম নাই—তপস্যার নিবৃত্তি নাই। বাতাস উপর দিকে বাহির হইবার পথ না পাইয়া নীচের দিকে নামিল—পেটের মধ্যে গিয়া বিষম যন্ত্রণা দিতে লাগিল তবুও সিদ্ধার্থ গ্রাহ্য করিলেন না—মহাযোগে মগ্ন রহিলেন।

এইরূপে কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা, কত শীত মাথার উপর দিয়া গেল—সিদ্ধার্থ টের পাইলেন না। প্রথম প্রথম কখনো বা একটি তিল, কোন দিন একটি কুল, কোন দিন বা একটি মাত্র চাউল খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। শেষে তপস্যা যখন দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর আরম্ভ হইল—তখন তাহাও গেল, তিনি সম্পূর্ণরূপে অনাহারে একাসনে যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল।

এই ছয় বৎসরে একবারও ধ্যান ছাড়িয়া উঠিলেন না—একবারও পা মেলিলেন না। এই অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর মহা ধ্যানে থাকিয়া তাঁহার দেহ অত্যন্ত কৃশ—কঙ্কালসার হইয়া পড়িল রক্ত মাংস ও চামড়া শুকাইয়া গেল—চক্ষু এত বসিয়া গেল যে আর দেখা যায় না—মুখের হাড় অত্যন্ত উঁচু হইয়া উঠিল। তাঁহার অমন সুন্দর লাবণ্যময় দেহ এত বিকৃত হইয়া পড়িল যে মানুষ বলিয়া আর চিনিবার জো রহিল না। কাঠুরিয়া ও রাখালগণ তাঁহাকে পিশাচ মনে করিয়া গায়ে ধূলি ও উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া মারিতে লাগিল। তিনি বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়া গিয়াছেন—শিষ্যগণ বহু চেষ্টাতেও তাহা বুঝিতে পারিল না।

কিন্তু এই ছয় বৎসর কাল এত করিয়াও সিদ্ধার্থ তাঁহার কাম্য বস্তু পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন যে শরীরকে এরূপে নষ্ট করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না—তখন সেই মহা যোগাসন ছাড়িয়া উঠিলেন। কিন্তু হয় এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে নদীর তীরে দুই চারি পা যাইতেই তার দেহ বহিল না—মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। শিষ্যগণ বহু চেষ্টায় শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।

তখন সিদ্ধার্থ বুঝিলেন যে গেরুয়া পরিয়া, শরীরকে কষ্ট দিয়া শুধু যোগ-ধ্যানে বসিয়া থাকিলেই পরম বস্তু লাভ করা যায় না মহাজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বরং শরীর রক্ষা করা আবশ্যিক—চিন্তবৃত্তি সবল রাখা প্রয়োজন। তখন হইতে প্রত্যহ অল্প অল্প করিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিলেন—ধীরে ধীরে শরীরে বল সঞ্চয় হইতে লাগিল। এতদিন ধ্যানে বসিয়া থাকিয়া তাঁহার বস্ত্রখণ্ড একেবারে নষ্ট হইয়াছিল সুতরাং

নদীতীরের শ্মশান হইতে একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া পরিধান পূর্বক লজ্জা-নিবারণ করিলেন।

কিন্তু ইহাতে এক বিপত্তি ঘটিল। যে পাঁচজন শিষ্য তাঁহার কাছে ছিল, তাহারা মনে ভাবিল যে গুরু বুঝি আধ্যাত্মিক যোগ-যাগ ছাড়িয়া আবার সংসারে মন দিয়াছেন, নইলে ছয় বৎসরের পরে আবার আহারে রুচি হইল কেন? লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য কাপড় পরিলেন কেন? সুতরাং এমন ধর্মভ্রষ্ট গুরুর কাছে থাকিয়া ফল কি? এই সব ভাবিয়া তাঁহারা সিদ্ধার্থকে পরিত্যাগ করিয়া কাশীর নিকটে ঋষিপত্তন নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। এইবার সিদ্ধার্থ-সম্পূর্ণরূপে একাকী হইলেন।

যে পরম ধন লাভের আশায় তিনি পিতামাতা পত্নী-পুত্র রাজ্য ঐশ্বর্য্য-ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, যাহার জন্য কঠোরতম যোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পড়িয়াছিলেন—সে ধন মিলিল না। কি করিলে তাহা পাইবেন সেই ভাবনায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে বন্ধু বান্ধবের উৎসাহ বাক্যে কোথায় মনে বল সঞ্চয় করিবেন না কপাল ক্রমে তাঁহার শিষ্য পাঁচজনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। একটা মুখের কথা বলিয়া সহানুভূতি দেখাইবে এমন কেহ রহিল না।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### প্রলোভন-যুদ্ধ

তখন সিদ্ধার্থের মন নিরাশায় ডুবিল। তবে কি যাহা পাইবার আশায় এত ত্যাগ স্বীকার করিলেন তাহা পাইবেন না? শাস্ত্র পাঠে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যোগ শিক্ষা করিয়া যে পথ ধরিয়াছিলেন তাহাতে কিছুই লাভ হইল না। তবে কি তিনি সে চেষ্টা ছাড়িয়া আবার গৃহে ফিরিয়া যাইবেন?

এই কথা ভাবিতেই পিতামাতার কথা মনে পড়িল, পত্নী পুত্রের

কথা মনে পড়িল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কথা মনে পড়িল, রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ভোগ বিলাসের কথা মনে পড়িল। তাঁহার মন টলিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল—যখন এত করিয়াও ইষ্টবস্তু পাইলাম না, তখন ফিরিয়া যাই, আবার মনে হইল—যখন এত চেষ্টা করিয়াছি, তখন আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখি না কেন? এই দুই ভাবের মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধার্থ টলমল করিতে লাগিলেন।

ঘরের দরজা যতক্ষণ দৃঢ় অর্গলে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ নিতান্ত জোর করিয়াও হাওয়া ঢুকিতে পারে না—বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিয়াই ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেই অর্গল একবার একটু আলগা করিলেই অমনি হু হু করিয়া বাতাস ঢুকিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দেয়। সিদ্ধার্থের মন যতদিন দৃঢ়—অটুট ছিল, ততদিন আশেপাশে অহোরাত্র ঘুরিয়াও রিপুর দল কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু যেই তাহারা দেখিল যে কুমারের দৃঢ়চিত্ত টলিয়াছে—মনের কপাট আলগা হইয়াছে, অমনি সকলে বেগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল।

পাপের স্বরূপ বিকটমূর্ত্তি দেখিলে মানুষ ভয়ে শিহরিয়া উঠে—কখনো সে পথে যাইতে চাহে না, তাই পাপের অবতার রিপুগণ নানারকম প্রলোভনজনক সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দিয়া মধুর প্রলোভনে তাহাদিগকে আয়ত্ন করিয়া ফেলে। সুধা ভাবিয়া বিষ খাইয়া মানুষ জুলিয়া মরে। এতদিন পরে রিপুগণ যেমন একটু সুযোগ পাইল অমনি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল।

সিদ্ধার্থের তখন যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর উৎসাহজনক বাক্য বিশেষ আবশ্যক। অবস্থা বুঝিয়া ‘মার’ পরম সুন্দর করুণাময় মূর্ত্তি ধরিয়া কুমারকে দেখা দিল, এবং নানারূপ কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার মন হরণপূর্ব্বক তাঁহার জন্য যেন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল—“ভাই, তোমার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। আহা রাজপুত্র তুমি—কি হইয়াছে দেখ দেখি। তোমার পানে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়। অমন সোনার দেহ—অপরূপ রূপ-লাবণ্য শুকাইয়া



গিয়াছে। তোমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই। ছি ছি, একি মূর্খের মত কার্য্য করিতেছ—বৃথা আত্মহত্যা ফল কি? যাহা খুঁজিতেছ তাহা এ পথে মিলিবে না। উঠ—ঘরে যাও—শাস্ত্রমত ক্রিয়া-কলাপ করিতে থাক, তাতেই পুণ্য হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আত্মনাশপূর্ব্বক কেন অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ?”

মারের কথায় সিদ্ধার্থের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মন ঈষৎ-মাত্র বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই নানা আবজ্ঞানা আসিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অমনি তখনি তিনি আত্মজয় করিলেন, কহিলেন—“আমাকে মজাইতে পারিবে না। যাহারা পৃথিবীর ভোগ সুখ আকাজ্জ্ঞা করে তুমি ও তোমার সহচরেরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পার, আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ চাহি না, মৃত্যুকে ভয় করি না, ইন্দ্রিয় দমন ব্রত লইয়াছি—তুমি আমাকে ছুঁতেও পারিবে না—দূর হও।” মার দূরে পলাইল।

‘মার’ পলাইল বটে, কিন্তু তিনি নিস্তার পাইলেন না, মারের সহচর অন্যান্য রিপুগুলি একে একে নানা রকম সুবেশে সজ্জিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। সংশয়, আত্মবোধ, প্রবৃত্তি, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকেই বহুপ্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সকলেরই অস্ত্র তীক্ষ্ণ—সকলেরই অস্ত্র অব্যর্থ—মানুষকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। কিন্তু সিদ্ধার্থের কিছুই করিতে পারিল না।

কাহারও অস্ত্র গা ঘেষিয়া চলিয়া গেল—ছুঁইতে পারিল না, কাহারও অস্ত্র চর্ম্মের উপর একটু মাত্র ছড়িয়া দিল—ভেদ করিতে পারিল না, কাহারও অস্ত্র বা অস্থি স্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। কেহই তাঁহাকে জয় করিতে পারিল না। কেবল ‘সংশয়ের’ অব্যর্থ অস্ত্র তাঁহাকে একটুমাত্র বিচলিত করিল। তখন রিপুদলও একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া সংশয় এবং অবিশ্বাসের দ্বারা তাঁহাকে জয় করিবার জন্য অন্তরালে থাকিয়া মহাচেষ্টা করিতে লাগিল।

কথা মনে পড়িল, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কথা মনে পড়িল, রাজপুরীর ঐশ্বর্য্য-সম্পদ ভোগ বিলাসের কথা মনে পড়িল। তাঁহার মন টলিতে লাগিল। একবার ইচ্ছা হইল—যখন এত করিয়াও ইষ্টবস্তু পাইলাম না, তখন ফিরিয়া যাই, আবার মনে হইল—যখন এত চেষ্টা করিয়াছি, তখন আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখি না কেন? এই দুই ভাবের মধ্যে পড়িয়া সিদ্ধার্থ টলমল করিতে লাগিলেন।

ঘরের দরজা যতক্ষণ দৃঢ় অর্গলে বদ্ধ থাকে, ততক্ষণ নিতান্ত জোর করিয়াও হাওয়া ঢুকিতে পারে না—বাহির হইতে দ্বারে আঘাত করিয়াই ফিরিয়া যায়। কিন্তু সেই অর্গল একবার একটু আলগা করিলেই অমনি হু হু করিয়া বাতাস ঢুকিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দেয়। সিদ্ধার্থের মন যতদিন দৃঢ়—অটুট ছিল, ততদিন আশেপাশে অহোরাত্র ঘুরিয়াও রিপুর দল কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু যেই তাহারা দেখিল যে কুমারের দৃঢ়চিত্ত টলিয়াছে—মনের কপাট আলগা হইয়াছে, অমনি সকলে বেগে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল।

পাপের স্বরূপ বিকটমূর্ত্তি দেখিলে মানুষ ভয়ে শিহরিয়া উঠে—কখনো সে পথে যাইতে চাহে না, তাই পাপের অবতার রিপুগণ নানারকম প্রলোভনজনক সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দিয়া মধুর প্রলোভনে তাহাদিগকে আয়ত্ন করিয়া ফেলে। সুধা ভাবিয়া বিষ খাইয়া মানুষ জুলিয়া মরে। এতদিন পরে রিপুগণ যেমন একটু সুযোগ পাইল অমনি সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া কুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল।

সিদ্ধার্থের তখন যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর উৎসাহজনক বাক্য বিশেষ আবশ্যক। অবস্থা বুঝিয়া ‘মার’ পরম সুন্দর করুণাময় মূর্ত্তি ধরিয়া কুমারকে দেখা দিল; এবং নানারূপ কথায়-বার্ত্তায় তাঁহার মন হরণপূর্ব্বক তাঁহার জন্য যেন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উপদেশ দিতে লাগিল—“ভাই, তোমার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইতেছে। আহা রাজপুত্র তুমি—কি হইয়াছে দেখ দেখি। তোমার পানে চাহিলে বুক ফাটিয়া যায়। অমন সোনার দেহ—অপরূপ রূপ-লাবণ্য শুকাইয়া

গিয়াছে। তোমার মৃত্যুর বিলম্ব নাই। ছি ছি, একি মূর্খের মত কার্য্য করিতেছ—বৃথা আত্মহত্যা ফল কি? যাহা খুঁজিতেছ তাহা এ পথে মিলিবে না। উঠ—ঘরে যাও—শাস্ত্রমত ক্রিয়া-কলাপ করিতে থাক, তাতেই পুণ্য হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া আত্মনাশপূর্ব্বক কেন অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ?”

মারের কথায় সিদ্ধার্থের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মন ঈষৎ-মাত্র বিচলিত হইয়াছে বলিয়াই নানা আবর্জ্জনা আসিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। অমনি তখনি তিনি আত্মজয় করিলেন, কহিলেন—“আমাকে মজাইতে পারিবে না। যাহারা পৃথিবীর ভোগ সুখ আকাজ্জা করে তুমি ও তোমার সহচরেরা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পার, আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আমি পৃথিবীর কোন সুখ ভোগ চাহি না, মৃত্যুকে ভয় করি না, ইন্দ্রিয় দমন ব্রত লইয়াছি—তুমি আমাকে ছুঁতেও পারিবে না—দূর হও।” মার দূরে পলাইল।

‘মার’ পলাইল বটে, কিন্তু তিনি নিস্তার পাইলেন না, মারের সহচর অন্যান্য রিপুগুলি একে একে নানা রকম সুবেশে সজ্জিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। সংশয়, আত্মবোধ, প্রবৃত্তি, মাৎসর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেকেই বহুপ্রকার তীক্ষ্ণধার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। সকলেরই অস্ত্র তীক্ষ্ণ—সকলেরই অস্ত্র অব্যর্থ—মানুষকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। কিন্তু সিদ্ধার্থের কিছুই করিতে পারিল না।

কাহারও অস্ত্র গা ঘেষিয়া চলিয়া গেল—ছুঁইতে পারিল না, কাহারও অস্ত্র চর্ম্মের উপর একটু মাত্র ছড়িয়া দিল—ভেদ করিতে পারিল না, কাহারও অস্ত্র বা অস্থি স্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া গেল। কেহই তাঁহাকে জয় করিতে পারিল না। কেবল ‘সংশয়ের’ অব্যর্থ অস্ত্র তাঁহাকে একটুমাত্র বিচলিত করিল। তখন রিপুদলও একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া সংশয় এবং অবিশ্বাসের দ্বারা তাঁহাকে জয় করিবার জন্য অন্তরালে থাকিয়া মহাচেষ্টা করিতে লাগিল।

সিদ্ধার্থ ভাবিতে লাগিলেন—যাহার জন্য রাজবাটী শ্মশান করিয়াছি, পুত্রগতপ্রাণ পিতামাতাকে জীবন্ত করিয়াছি, একনিষ্ঠ প্রিয়তমা জীবন-সঙ্গিনী সহধর্মিণীর একমাত্র আশ্রয় তরুর মূলে কুঠারাঘাত করিয়া— ছিন্ন লতার মত—সেই অনাথা রমণীকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছি, আত্মজের মুখ পর্য্যন্ত দেখি নাই—সে পরম রত্ন—সে মুক্তিধন পাইলাম কই? শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকলাপ, যোগধ্যান করিয়া দেখিলাম—সকলই বৃথা হইল। তবে কি মানুষের ভর করিয়া দাঁড়াইবার স্থান নাই? পৃথিবীর শোক-দুঃখ, পাপ-তাপের হস্তে কাহারও পরিত্রাণ নাই? সকলই কি মিথ্যা? সকলই কি ব্যর্থ? তবে আর প্রাণধারণে ফল কি? যদি জীবের দুর্গতিই দূর করিবার উপায় করিতে না পারিলাম—তবে এ বৃথা শরীর বহিয়া ফল কি?

ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধার্থ পাগলের মত হইয়া উঠিলেন, নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার বুক ফাটিবার উপক্রম হইল—প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। গরম জলের মধ্যে মৎস্য যেমন অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়—তিনিও তেমনি ভাবনায় ভাবনায় জর্জরিত হইয়া ছটফট করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার মনে হইল কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না। যেখানে যাহাই অনুষ্ঠিত হউক একজন না একজন তাহা করিতেছে বলিয়াই হইতেছে, নহিলে কার্য্য লোপ পায়। কার্য্য লোপ পাইলে সৃষ্টি থাকে না। তবে এই যে এত বড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইহার রচনাও তো কাহারো কার্য্য, নহিলে এ জগৎ সৃষ্ট হইত না। কেহ করিয়াছে বলিয়া হইয়াছে—কেহ চালাইতেছে বলিয়া চলিতেছে। তবে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে একজন হর্ত্তাকর্ত্তা নিয়ন্তা আছেন—কে তিনি?

তখন সিদ্ধার্থের অন্তরে এক নূতন আলো জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে তিনি এক নূতন পথ দেখিতে পাইলেন। তখন বুঝিলেন যে শাস্ত্র কর্ত্তৃক বিপথে চালিত হইয়া তিনি এতদিন কেবল অন্ধকারে ঘুরিয়া মরিয়াছেন, আত্মবলে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া অন্ধকার হইতে ক্রমশাধিকতর অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়াছেন। যে মহাশক্তিবান সর্ব্বশক্তির

আধার মহাপুরুষ এই বিশ্ববিধানের বিধাতা—তঁাহার দয়া ভিন্ন জীবের মুক্তিলাভ অসম্ভব। তঁাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া তঁাহার প্রতি অবহেলা করিয়া তিনি কি এ পর্য্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত না হইয়াছেন তঁাহাকে চেনা চাই—তঁাহার করুণা লাভ করা চাই—তঁাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, যে অমূল্য বস্তু খুঁজিতেছেন তাহা অনায়াসেই পাইবেন এবং জগতকে সে মহামূল্য রত্ন বিতরণ করিয়া সকলের দুঃখভার লাঘব করিতে পারিবেন।

তখন তিনি আরও বুঝিলেন যে সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা যখন মানব সৃষ্টি করিয়াছেন তখন অবশ্যই ইহাতে তঁাহার কোন উদ্দেশ্য আছে, নহিলে এ অকারণ সৃষ্টি করিতেন না—বিনা উদ্দেশ্যে কেহই কিছু করে না। সুতরাং কঠোর যোগবলে শরীর পীড়ন পূর্ব্বক ধ্বংস করিলে তঁাহার কার্য্যে বাধা দেওয়া হয় তাহাতে ফল হইবে কেমন করিয়া? এ শরীর যত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

শরীর রক্ষা করিতে হইবে বটে, কিন্তু রিপূর বশীভূত করিতে পারিবে না। তৈল যেমন জলে মিশে না—অথচ ভাসিয়া থাকে, সেই রকম সংসারের মধ্যে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিষয়ের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে হইবে। কোন কিছুতে মজিবে না—কোন কিছুতে ডুবিবে না—কোন কিছুতে টলিবে না। এইরূপ আত্মজয় পূর্ব্বক তঁাহার অনুগ্রহ-লাভের জন্য আরাধনা করিতে হইবে, তাহা হইলেই পরম ধন নিৰ্ব্বাণ-মুক্তিলাভ হইতে পারিবে।

এতদিনে সিদ্ধার্থের মন যেন একটু শান্ত হইল, প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। সেইদিন তন্দ্রাঘোরে আবার এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়া তঁাহার মনের দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিল।

তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে দেবর্ষি নারদ ত্রিতন্ত্রী বীণা বাজাইতেছেন। বীণার তিনটি তারের একটি অত্যন্ত টানিয়া বাঁধা। তাহা হইতে অত্যন্ত কঠোর কর্কশ সুর উঠিতেছে, শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়। অন্যটি অত্যন্ত শ্রুত-ঢিলা—তাহা হইতে মোটেই সুর উঠিতেছে না। কিন্তু মাঝের তারটি ঠিক ওজন মত যথানিয়মে বাঁধা। সেই তারে যখন তিনি ঘা

দিলেন, তখন অতি মনোরম বঙ্কার উঠিয়া মদিরতানে আকাশ বাতাস ভাসাইল।

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—কিন্তু স্বপ্নের কথা তাঁহার প্রত্যক্ষবৎ মনে হইতে লাগিল। তিনি তখন বুঝিলেন যে একদিকে শরীর নিগ্রহ এবং অন্যদিকে বিলাস-সন্তোগ—এই দুইটিই পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপথ ধরিয়া সাধনা করিতে হইবে তাহা হইলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

তাঁহার মনে তখন অটুট বিশ্বাস আসিল আর সংশয়ের রেখাপাত মাত্র রহিল না। তিনি আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির করিলেন যে শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া সর্ববিষয়ে নিষ্পৃহ থাকিয়া সেই মহাপুরুষের করুণালাভের জন্য বৃক্ষমূলে ধ্যানে বসিবেন। তাহা হইলে রৌদ্র বৃষ্টি, হিম বা উত্তাপে তাঁহার দেহকে ক্লিষ্ট করিতে পারিবে না। অথচ ভোগ-বিলাস পদতলে লুপ্তিত হইবে।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### সিদ্ধি

উরুবিশ্ব গ্রামের কাছে ‘সেনানী’ নামে আর একটি গ্রাম ছিল—সেই গ্রামে এক ধনীর কন্যা বাস করিতেন, তাঁহার নাম সুজাতা।

কুমারী কালে সুজাতা ‘ন্যাগ্রোধ’ বৃক্ষের অধিষ্ঠাতা দেবতার কাছে মানসিক করিয়াছিলেন যে তিনি যদি মনোমত স্বামী লাভ করেন এবং যদি প্রথমে তাঁহার পুত্র সন্তান হয় তাহা হইলে চৈত্র পূর্ণিমাতে তিনি দেবতার পূজা দিবেন। বিধাতার কৃপায় তাঁহার সকল কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। সুজাতা চৈত্র পূর্ণিমায় সেই বৃক্ষতলে নিজ হস্তে পায়সান্ন দিয়া পূজা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

শুদ্ধাচারে পবিত্র চিন্তে পায়স রাঁধিয়া সুজাতা তাঁহার দাসী পূর্ণাকে কহিলেন—“যাও বৃক্ষতল উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিয়া আইস।” পূর্ণা

গিয়া সেই গাছের তলদেশ উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া নিকাইতে লাগিল।

গাছটি প্রকাণ্ড—বহুদিনের, খুব মোটা। পূর্ণা তাহার একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঘুরিয়া পরিষ্কার করিতে করিতে পিছন দিকে গিয়া পড়িল এবং আপন মনে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

তখন প্রভাতকাল, সিদ্ধার্থ নিশ্চিত মনে নদীজলে হাত মুখ ধুইয়া সেই বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং সুপরিষ্কৃত দেখিয়া সেইখানে বসিলেন। পূর্ণা তখন গাছের পিছন দিক মার্জনা করিতেছিল—সিদ্ধার্থের আগমন জানিতে পারিল না।

পূর্ণার কাজ শেষ হইলে যখন সে ঘরে যাইবার জন্য উঠিল, তখন গাছের সম্মুখদিকে আসিয়া সিদ্ধার্থকে উপবিষ্ট দেখিয়া ভাবিল যে, বৃক্ষ দেবতা দয়া করিয়া দেখা দিয়াছেন। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সে সুজাতাকে সংবাদ দিবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে গৃহ অভিমুখে ছুটিল।

সুজাতা স্বর্ণপাত্রে পায়সান্ন লইয়া বৃক্ষতলে আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে পূর্ণা উপস্থিত হইয়া দেবতার আগমন সংবাদ জানাইল। সুজাতা পরম আনন্দে মহাভক্তিভরে পায়সের পাত্রটি মাথায় লইয়া দ্রুতপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সিদ্ধার্থের সম্মুখে তাহা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। “তোমার কামনা পূর্ণ হউক” বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সিদ্ধার্থ পায়সান্ন পাত্র হস্তে লইয়া উঠিলেন, সুজাতা হ্রষ্ট মনে ঘরে ফিরিয়া গেল।

সিদ্ধার্থ পায়স হস্তে নদীকূলে আসিলেন এবং তীরে তাহা রাখিয়া ছয় বৎসরের পর সেই প্রথম নদীজলে অবগাহন করিলেন। তাঁহার শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। তারপর তীরে উঠিয়া পেট ভরিয়া পায়স খাইয়া সুবর্ণ পাত্র নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন। তারপর সমস্ত দিন সেই নদীতীরে বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যার সময় বনে ঢুকিলেন।

বনের ভিতর কিছুদূর যাইতেই সিদ্ধার্থ এক পুরাতন বিশাল বটবৃক্ষ

দেখিতে পাইলেন—সেই বৃক্ষমূলে ধ্যানে বসিবেন স্থির করিলেন। তারপর কতকগুলি নধর কোমল দুর্ব্বাঘাস সংগ্রহ করিয়া বটবৃক্ষতলে আসন প্রস্তুত করিলেন, তারপর সেই আসনের উপরে—কোলে হাত রাখিয়া—পদ্মাসনে ধ্যানে বসিলেন এবং শীঘ্রই সেই ধ্যানে তন্ময় হইয়া গেলেন।

রিপুদল দেখিল যে রাজকুমার এইবারে সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই পথে থাকিয়া সাধনাদ্বারা সিদ্ধ হইলে সংসার হইতে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবেন। অতএব এই বেলা ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে টলাইতে না পারিলে তাহাদের আর উপায় নাই। তখন সেই অন্ধকার ছায়াদেহধারীগণ একে একে আসিয়া সকলেই সেই বনে জমিল। মারের কন্যাসকল—রাগ, আরতি, তৃষ্ণা প্রভৃতিও আসিয়া যোগ দিল।

তাহাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ধরিয়া নানা পরামর্শ চলিল, তারপর সকলে নিজ নিজ বীভৎস মূর্ত্তি ছাড়িয়া নানা প্রকার সুন্দর মূর্ত্তি ধরিল। এমন কি কেহ গৌতমী এবং কেহ গোপার মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ধরিতে ছাড়িল না। তারপর একে একে সিদ্ধার্থের যোগ নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল।

ধর্ম্ম মহাক্রেশে সঞ্চিভ হয়, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায়—বহুকালের সে তপস্যার ফল নষ্ট হইয়া যায়। মানুষ ধর্ম্মপথে দিন দিন যতই উন্নতি করিতে থাকে—ততই নূতন নূতন ভাবের প্রলোভন আসিয়া তাহাকে মজাইতে চাহে—পরীক্ষার উপরে পরীক্ষার কঠোরতায় তাহার অস্থি-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া যায়। সে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, পাপের ছায়া পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে মুছিয়া গেলে, তবে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হইয়া শেষে মুক্তি লাভ হয়। যতদিন পাপের মূল—প্রবৃত্তির বীজটি পর্য্যন্ত হৃদয় হইতে উৎপাটিত না হইয়া যায়—ততদিন মানবের নিস্তার নাই।

সিদ্ধার্থ এবার কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মলাভে নিৰ্ব্বাণ-মুক্তির বাসনায় ধ্যানে বসিয়াছেন—সুতরাং রিপুদল প্রাণপণ বল প্রয়োগে শেষ



কামড় কামড়তে আরম্ভ করিল। এইরূপ অস্তিম পরীক্ষায় পড়িয়া— এইরূপ শেষ যুদ্ধে হারিয়া কত মহা মহা তপস্বী আজীবনের সঞ্চিত ধর্মধন হারাইয়াছেন, কত মহাজ্ঞানী সর্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত লোনা-জলে পিপাসা মিটাইতে গিয়া জন্ম জন্ম দুঃখভার বহন করিয়াছেন সিদ্ধার্থ ত তাঁহাদের তুলনায় বালকমাত্র, তিনি কি সেই ভীষণ অস্তিম সমরে জয়লাভ করিতে পারিবেন?

তখন সিদ্ধার্থের দৃঢ় চিত্ত তাঁহার সহায় হইল। জীবের দুঃখ দেখিয়া শৈশব হইতে সেই যে তাঁহার বুক ফাটিতেছিল—সেই অসাধারণ জীব-দয়া অভেদ্য বর্মে এক্ষণে তাঁহার সর্বাস্ত্র ঢাকিয়া রহিল, সুতরাং রিপুদলের সর্বপ্রকার অব্যর্থ সন্ধান ব্যর্থ হইয়া গেল। এমন কি যখন দুর্দান্ত পাপ-সহচরী গৌতমীর মূর্তি ধরিয়া তাঁহার ধ্যানরুদ্ধ চক্ষের সম্মুখে ‘হা পুত্র, হা পুত্র’ বলিয়া কপালে করাঘাত করিয়া করুণ রোদনে বন কাঁপাইল তখনও তিনি চক্ষু মেলিলেন না—নির্বিকার, নিষ্পন্দ থাকিয়া কেবলমাত্র কহিলেন—“দূরহ পাপ-সহচরী, অবিদ্যা-মোহ আর আমাকে মুক্ত করিতে পারিবে না, তোমাদের শক্তি আমার কাছে পরাজিত হইল। আমি দিব্য-দৃষ্টিতে পরমবস্তু দর্শন করিতেছি আর তোদের কি সাধ্য যে আমাকে ভুলাইয়া মজাইবি?” তীব্র নিরাশার নিশ্বাস ফেলিয়া সে দূরে পলাইল।

তখন আর একজন আসিল। এইবার সিদ্ধার্থের কঠোরতম পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তাঁহার ধ্যান-নীমিলিত নয়ন সম্মুখে, তাঁহার স্তব্ধ কর্ণ যুগলের ধারে ধারে, তাঁহার পদ্মাসনে উপবিষ্ট উর্দ্ধ দেহের চারিপার্শ্বে বেড়িয়া গোপার করুণ বিনীত সুধা-স্বরলহরী বহিল। ‘প্রাণনাথ কি দোষে দাসীকে ত্যাগ করিলে, একবার চক্ষু মেলিয়া চাহ, দেখ তোমার প্রিয়তমা, তোমার পুত্রের গর্ভধারিণী রাজবধূ আজ তোমার জন্য গৃহ ছাড়িয়া এই দূর বনে খুঁজিতে আসিয়াছি। দেখ অনাহারে আমার সর্বাস্ত্র কাঁপিতেছে—পিপাসায় জিহ্বা শুষ্ক হইয়াছে—কন্টকে সর্বাস্ত্র ক্ষতবিক্ষত, পদদ্বয় আর চলে না। এইরূপেই কি বিনা দোষে নারী হত্যা করিতে হয়? দেখ একটিবার চাহিয়া দেখ—

প্রাণ যায়, প্রাণনাথ রক্ষা কর, উঃ আর যে পারি না—প্রাণেশ্বর—উঃ—”

সেই বিনীত স্বরলহরী করুণ-ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভাসাইল, কাননের পশুপক্ষীকুলও নীরবে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল, সমীরণও গোপার শ্বাসে সন্তপ্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ অচল-অটল-স্থির দৃঢ় রহিলেন।

যখন গোপার শোকাক্তস্বর অত্যন্ত বাড়িল, জলপ্লাবনের মত বিষম করুণার ধারায় বনভূমি ভাসাইয়া ছুটিল তখন তিনি চক্ষু না চাহিয়াই দৃঢ়স্বরে কহিলেন—

“দূর হ দুষ্চারিণী, প্রিয়ার আকৃতি ধরিয়া আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিস? জ্ঞানপ্রার্থীজন কি কখনো ছায়া দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হয়? প্রিয়ার অবয়ব গ্রহণ করিয়াছিস্ বলিয়া অভিশাপ দিলাম না—এখনই দূর হইয়া যা।”

“বাপ্রে—মলুম্—গেলুম্” বলিতে বলিতে চক্ষের নিমেষে শূন্যে মিশাইয়া গেল।

এইরূপে প্রত্যেক রিপু এবং তাহাদের সহচারিণীগণ বিবিধ প্রকার নূতন নূতন উপায়ে সিদ্ধার্থকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি অচল অটল রহিলেন, সুতরাং ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সকলেই নিরাশ চিন্তে রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল।

পাপেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইল—রিপুর অধিকার গেল। প্রবৃত্তি লোপ পাইয়া নিবৃত্তি আসিল—মন দয়া, প্রেম ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্ত্বাধীন হইল, তখন সিদ্ধার্থ একেবারে পূর্ণভাবে সুখ, দুঃখ, অনুরাগ, বিরাগ, স্তুতি, নিন্দা, কার্য্য, ক্রিয়া, জীবন ও মৃত্যুর অতীত হইয়া গেলেন, তখন তৈল যেমন জলে ভাসে—তিনিও সংসারে থাকিয়া সংসারের বহির্ভূত হইলেন—সাধনায় সিদ্ধিলাভের আর কি বিলম্ব ঘটিতে পারে?

তখন তাঁহার চরম জ্ঞান আসিল তিনি বুঝিলেন—তাঁহার জন্ম নাই, জন্মভূমি নাই, নাম নাই—গোত্র নাই, বর্ণ নাই, জাতি নাই—

জীবন নাই—আয়ু নাই, ধ্বংস নাই—মরণ নাই—তিনি সেই চির-পুরাতন মহাজ্ঞানের সমষ্টি?

ধন্য সিদ্ধার্থ! ধন্য মহা-সাধনা!

এতকালের পর তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। সে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য রাজপুত্র সর্ব সুখভোগ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, যে জ্ঞানলাভের জন্য শরীর ও মনকে কঠোররূপে যন্ত্রণা দিয়া মহা তপস্যা করিয়াছেন—এতদিনে সেই জ্ঞান লাভ করিলেন। যৌবনে যে জরা-মৃত্যু দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, জীবের মহা দুঃখ ঘুচাইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, মহা সাধনার পরে তাহা কাটাইবার জ্ঞান উপার্জন করিলেন। কিন্তু শুধু জ্ঞান উপার্জনেই ত সিদ্ধ হওয়া যায় না। যাহাতে অমানুষী শক্তি জন্মিয়া জরা-মরণের উপর আধিপত্য লাভের ক্ষমতা জন্মে তাহার আশায় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আবার ধ্যানে বসিলেন।

দিবারাত্রি সমানভাবে সে মহাধ্যান চলিল। ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান দূরে গেল—তিনি মৃতের মত হইলেন, শারীরিক ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। আর তাঁহার চিন্তের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য রহিল না, কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ শক্তি লাভ করিলেন—মরিয়া জীবন পাইলেন।

আর তাঁহার মনের চাঞ্চল্য রহিল না, আশা রহিল ন্দ, তৃষ্ণা রহিল না, আকাঙ্ক্ষা রহিল না, অনুরাগ রহিল না, বিরাগ রহিল না, ইচ্ছা রহিল না; উদাসীনতাও রহিল না—মহাশান্তিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুখের নির্বাণ—দুঃখের নির্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্বাণ—প্রবৃত্তির নির্বাণ—ইচ্ছার নির্বাণ—আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ হইল। সর্বপ্রকার নির্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইলেন। তাঁহার মহা-সাধনায় সিদ্ধি মিলিল। যে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি সিদ্ধ হইলেন সেই গাছটি—“বোধি বৃক্ষ” বা “বোধিদ্রুম” বলিয়া বিখ্যাত হইল।

নির্বাণ লাভ করিয়া বুদ্ধদেব সেই বোধিবৃক্ষের মূলে এবং নিকটে সাত সপ্তাহ বাস করিলেন, সে স্থান ছাড়িয়া তাঁহার প্রাণ আর অন্য

কোথাও যাইতে চাহিল না। এই সাত সপ্তাহের মধ্যে একটি দিনের জন্যও ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, আলস্য কি তন্দ্রা আসিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিতে পারিল না।

তাঁহার জীবনের একমাত্র মহান উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে। আজীবন যে বস্তুর জন্য লালায়িত ছিলেন, যাহার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, যাহার জন্য অশেষ কষ্ট সহিয়াছেন, যাহার জন্য অসাধ্য সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই—এতদিনে সেই পরম বস্তু লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে কি করিবেন?

সেই নির্জরন কাননে নিভৃত বৃক্ষমূলে নিশ্চিত হইয়া বাস করিবার জন্যই কি তত কষ্ট তত ত্যাগ স্বীকার করিয়া দুর্লভ বস্তু লাভ করিলেন?

না—জীবের দুর্গতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিতেছিল, তিনি সেই পরম নিধি দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া জগতের দুঃখ মোচন করিবেন।

—

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### প্রচার

কিন্তু লোকে তাঁহার কথা শুনিবে কি, তাঁহার কাছ হইতে সে অমূল্য রত্ন যত্ন করিয়া গ্রহণ করিবে কি?

তখনকার সময়ে ধর্মের প্রাণ ছিল—প্রায়শ্চিত্ত, ক্রিয়াকলাপ, বলিদান, তন্ত্র-মন্ত্র, দেবদেবীর উপর বিশ্বাস এবং ব্রাহ্মণগণের কথায় আস্থা। বুদ্ধদেবের নবধর্মের প্রাণ হইল—‘আত্মসংযম’ এবং ‘সর্ব-জীবে দয়া’। লোকে চিরপ্রচলিত ধর্মের সংসার ছাড়িয়া তাঁহার এই মধুর সত্য ধর্মের বিশ্বাস করিবে কি? চিরকালের সযত্নপোষিত হিংসাবৃত্তি ছাড়িয়া ইতর জাতীয় পশুপক্ষী কীট পতঙ্গটির জন্যও বেদনা অনুভব করিবে কি?

বুদ্ধদেব ভাবনায় আকুল হইলেন। কিন্তু যেই তাঁহার মনে জীবের দুর্গতির কথা জাগিল, যুগবদ্ধ পশুর কাতর আর্তনাদ মনে পড়িল। ধর্মের নামে ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুরতা এবং তত্ত্বমন্ডের বীভৎস কার্য্য সকল স্মরণ হইল অমনি তাঁহার মন করুণায় গলিয়া গেল। আর সম্ভব অসম্ভব জ্ঞান রহিল না, আর পারি-হারি বিচার করিলেন না। স্থির করিলেন—পরমব্রহ্মে আত্মস্থিতি করিয়া ধর্মচক্র গঠন পূর্ব্বক প্রচার করিবেন।

তখন সত্য প্রচারের জন্য মন অস্থির হইল—দ্বারে দ্বারে অমূল্য রত্ন বিলাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। একাকী সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সত্যের সংগ্রামে—মহা সত্যের বিজয় নিশান উড়াইতে চলিলেন।

তিনি প্রথমে তাঁহার প্রাচীন গুরুদ্বয় ‘আরাঢ়কালাম’ এবং ‘রুদ্রককে’ নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চলিলেন, কিন্তু সে স্থানে গিয়া যখন দেখিলেন যে তাঁহাদের কেহই আর জীবিত নাই, তখন তাঁহার ভূতপূর্ব্ব পাঁচজন শিষ্যকে দীক্ষিত করিতে চলিলেন।

সেই পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া বারানসীর তিন মাইল উত্তরে মৃগদাব নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধদেব সেইস্থানের উদ্দেশে চলিলেন। ক্রমে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গঙ্গায় খেয়া-নৌকা লোক পারাপার করিতেছিল। বুদ্ধদেব মাঝিকে পার করিয়া দিতে কহিলেন। মাঝি পারের পণ চাহিল। তিনি দরিদ্র ভিক্ষুক—পারের কড়ি কোথায় পাইবেন? নাবিককে বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন কিন্তু সে ব্যক্তি পণ ভিন্ন কিছুতেই তাঁহাকে পার করিল না। তখন তিনি আধ্যাত্মিক বলে গঙ্গার উপরে শূন্যপথে হাঁটিয়া পার হইলেন এবং মৃগদাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন বুদ্ধদেবের শরীর পরম লাবণ্যযুক্ত এবং তেজোময় হইয়াছিল, যে তাঁহাকে দেখিল—সেই আকৃষ্ট হইল—কেহই আর চিন্তু ফিরাইতে

পারিল না। দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পূর্বশিষ্যগণ ভাবিল যে ধর্ম্ভ্রষ্ট ও আকারভ্রষ্ট গুরুর সহিত সম্পর্ক রাখিবে না। কিন্তু যখন তিনি নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার অপূর্ব ক্লাস্তি ও ঐশ্বরিক তেজোদীপ্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। সেই দিনই সর্বপ্রথমে কোণ্ডাণ্য তাঁহার নবধর্ম্ম-দীক্ষিত হইলেন।

তারপর রাত্রে নির্জর্জন গগনতলে গহন বনের ভিতর বসিয়া সকল শিষ্যগণের সম্মুখে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মের মূল তত্ত্বকথা কহিলেন।

“যথার্থ ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সংসারবাসী তুচ্ছ ইন্দ্রিয় সুখ এবং ফলহীন কষ্টদায়ক দুঃখকর ব্রহ্মচর্য্য এই দুইই-ত্যাগ করিবে, আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি—সেই পথে চলিলে চক্ষু খুলিবে, দিব্যজ্ঞান পাইবে, শান্তি মিলিবে এবং পরিণামে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হইবে। আমার এই ধর্ম্ম-উপাসনার আটটি উপায়—সৎদৃষ্টি, সৎসঙ্কল্প, সৎবাক্য, সৎ ব্যবহার, উৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন, সৎস্মৃতি, সৎচেষ্টা এবং ধ্যান সমাধি। এই ধর্ম্মের চারিটি মহাসত্য—দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ এবং দুঃখ নাশের চেষ্টা। জন্মিলেই নানা প্রকারে দুঃখ পাইতে হয়। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুই দুঃখ। অপ্রিয়ের সহিত মিলন এবং প্রিয়জনের বিচ্ছেদও দুঃখ। বাসনা অতৃপ্ত থাকিলেও দুঃখ। মোট কথা, প্রবৃত্তিই দুঃখের মূল। জীবনে তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয় সুখ-তৃষ্ণাই সর্ব্বাধিক দুঃখের কারণ—এই তৃষ্ণা দূর করিতে পারিলেই দুঃখ দূর হইবে। পূর্বে যে আটটি উপায় বলিলাম—সেই আট প্রকারে চেষ্টা ও সাধনা করিলেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি মিলিবে। আমি নূতন জ্ঞান, নূতন চক্ষু, নূতন বিদ্যা, নূতন মেধা এবং নূতন আলোকে এ মহাসত্য দেখিয়াছি এবং পাইয়াছি। এই সত্য জীবন গঠিত করিয়া দুঃখের হস্ত হইতে চিরপরিত্রাণ পাইয়াছি—অক্ষয় মুক্তি লাভ করিয়াছি। তোমরাও এই পথে চলিয়া মুক্ত হও—ধরায় অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-রাজ্য স্থাপন কর।”

বুদ্ধদেবের মূল ধর্ম্মতত্ত্বের কথা শুনিয়া সকলের জ্ঞান চক্ষু ফুটিল।

কোণাণ্য প্রথমে শিষ্য হইয়াছিলেন, দ্বিতীয় দিনে ‘বাপা’, তৃতীয় দিনে ‘অদ্রীয়’, চতুর্থ দিনে ‘মহো নাম’ এবং পঞ্চম দিনে ‘অশ্বজিৎ’ এই পাঁচজন সর্বপ্রথম শিষ্য হইলেন।

বুদ্ধদেব তিন মাস পর্য্যন্ত মৃগদাবে থাকিয়া তাঁহার মহাসত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। একজন অদ্বিতীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়াছেন— এই কথা মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, দিন দিন বহু ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল, তিনিও অতি সহজ—সরল—সুমিষ্ট ভাষায় তাঁহার ধর্মের তত্ত্বকথা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। সেখানে বহুলোক তাঁহার ধর্ম গ্রহণপূর্বক দেবদেবীর উপাসনা ছাড়িল।

তিন মাসে ‘মৃগদাবে’ তাঁহার ষাট জন শিষ্য হইল। তখন তিনি তাহাদিগকে সত্যধর্মের প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠাইলেন। দেশপ্লাবিত শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে এই কয়জন সামান্য দীনহীন পথের কাঙাল ভিক্ষুক ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেশ-বিদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিল।

তারপর বুদ্ধদেব উরুবিল্ব বনের নিকটে ‘কাপাশী’ নামক গ্রামে ত্রিশজন ব্যভিচারী ধনী সন্তানকে শিষ্য করিলেন। তাহারা অতুল বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দীনহীন ভিক্ষুক সাজিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া দেশে দেশে ধর্মপ্রচারে চলিল।

উরুবিল্ব গ্রামে কাশ্যপ ও তাঁহার দুই ভাই বাস করিতেন। ইহারা তিন জনেই দেশবিখ্যাত সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক পণ্ডিত এবং অগ্নির উপাসক। বহু শিষ্য তাঁহাদের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। বুদ্ধদেব আপন শক্তিবলে কাশ্যপ ও তাঁহার ভ্রাতৃত্বকে নবধর্মে দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিলেন—কাশ্যপের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাঁহারা নবধর্মে দীক্ষিত হইলে পর—সেখানে তাঁহাদের যত শিষ্য-সেবক ছিল সকলেই দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিল। এইরূপে অতি অল্পকালেই বুদ্ধদেবের বহু শিষ্য হইয়া পড়িল। সকলকেই তিনি দেশ দেশান্তরে ধর্মপ্রচারে পাঠাইলেন—

তাহারা পরম আনন্দে এই মহা পূর্ণকার্য্যে উৎসাহ সহকারে গমন করিল।

তারপরে বুদ্ধদেব ‘রাজগৃহে’ গিয়া রাজা বিন্ধাসারকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শিষ্য করিলেন। মগধরাজ এবং কাশ্যপের মত দেশবিখ্যাত মহাপণ্ডিত বুদ্ধদেবের শিষ্য হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের খুবই সুবিধা হইল। দেখিতে দেখিতে দেশদেশান্তরে তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচারিত ও বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

বিন্ধাসার বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ‘বেনুবনে’ অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন—সে বন রাজপুরীর নিকটে, সুতরাং রাজা সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুবিধা পাইলেন।

সেই বেনুবনে দুইমাস কাল থাকিয়া বুদ্ধদেব নিত্য নিত্য বহু লোককে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন—দেশময় আনন্দ-কোলাহল উঠিল—দ্রোণ, হিংসা, অত্যাচার, পীড়ন দূরে গেল—মগধ শাস্ত্রিরাজ্য হইয়া উঠিল। সেইখানে দুই মাস পরে তিনি ‘উপতীষ্য’ এবং ‘কালীত’ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ সন্তানকে দীক্ষিত করিয়া তাহাদিগকে ‘সারিপুত্র’ এবং ‘মৌদগল্যায়ন’ নাম দিলেন এবং সেই সময় হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমাজ স্থাপন করিলেন—এই সমাজের নাম হইল ‘সংঘ’। ‘সারিপুত্র’ এবং ‘মৌদগল্যায়ন’ পরম উৎসাহবান, পরম তেজস্বী ও অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবক, সেইজন্য বুদ্ধদেব সেই দুইজনকে সেই সমাজের—‘সংঘের’—প্রধান পদ দিলেন।

সংসারে আলো, অন্ধকার দুই-ই আছে। বাধা না পাইলে স্রোতোবেগ যেমন প্রবল হয় না—তেমনি বিরুদ্ধাচারী না থাকিলেও কোন কার্য্য বিশ্বব্যাপী হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই সময় উপস্থিত হইল। যেমন বহুলোক নিত্য নিত্য তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল, তেমনি আবার অনেকে তাঁহাদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইল। প্রাচীন প্রথা নষ্ট করিতেছেন, ছেলেপুলেকে ভুলাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইতেছেন বলিয়া বহু লোক বুদ্ধদেবের বিপক্ষে গেল। তাহারা প্রাণপণে তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারে বাধা জন্মাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভিক্ষায় বাহির হইলে



তাড়াইতে লাগিল এবং বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার শিষ্যগণের বিস্তর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল। তখন বুদ্ধদেব দুঃখিত শিষ্যমণ্ডলীকে কহিলেন যে, “লোকে যাহা অমঙ্গল ভাবিয়া তোমাদিগকে তিরস্কার করিতেছে, তাহাই চিরমঙ্গল কর। ভয় নাই—সত্য চিরদিনই সত্য। এই সত্যই আমাদের অমোঘ অস্ত্র, এই সত্যবলে দিন দিন আমাদের ধর্মের প্রভা জগতে শান্তিরাজ্য আনিবে।”

সত্য সত্যই তাহাই ঘটিল—বিস্তর বাধা, বিস্তর নিন্দা, বিস্তর তিরস্কার, বিস্তর লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সত্য স্নান হইল না—দিন দিন বৌদ্ধ-ধর্মের স্রোত দেশদেশান্তরে প্লাবিত করিয়া বহিল।

যখন এইরূপে বুদ্ধের নাম দেশদেশান্তরে মুখে মুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য লোকের উপর লোক পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে আনা দূরে থাকুক—যে আনিতে গেল—সেও ফিরল না। সেই ধর্মের এমনি মোহিনী শক্তি, এমনি অদ্ভুত আকর্ষণ যে তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিল, সে-ই সে কথা ভুলিয়া গেল, নবধর্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষু হইয়া সংঘে রহিল অথবা প্রচার কার্য্যে দেশান্তরে চলিয়া গেল।

এইরূপে ক্রমাগত নয়জন লোকের পর শেষে একজন লোক গিয়া—নিজে সেই ধর্মগ্রহণপূর্ব্বক বুদ্ধদেবকে কপিলবাস্তুতে ফিরাইয়া আনিল। বিস্তর ভিক্ষু শিষ্য সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেব পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং সংঘের নিয়ম অনুসারে—রাজবাটিতে না গিয়া—কপিলবাস্তুর নিকটবর্ত্তী ন্যাগ্রোধ বনে আপনাদের বাসস্থান স্থাপন করিলেন।

বুদ্ধদেব দেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া সমস্ত কপিলবাস্তু নগর শূন্য করিয়া দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা পুষ্পমালা হস্তে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ন্যাগ্রোধ বনে ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্বয়ং রাজা তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতিকুটুম্বগণকে লইয়া বুদ্ধের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন না, সেইজন্য অনেকে অসন্তুষ্ট

হইলেন। সন্ধ্যা হইলে সকলে আবার নগরে ফিরিয়া আসিলেন ভিক্ষুগণ সেই বনে রহিলেন।

তারপরে বুদ্ধদেব রাজা শুদ্ধোদনকে, গৌতমীকে, গোপাকে এবং আপনার সাত বৎসরের পুত্র রাহুলকে তাঁহার সেই নবধর্মের দীক্ষা দিয়া তাঁহাদের হস্তে ভিক্ষা-পাত্র প্রদান করিলেন।

গৌতমীর পুত্র নন্দের বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক। পূর্বদিন সে বুদ্ধদেবের কাছে গিয়া তাঁহার ধর্মগ্রহণ পূর্বক ভিক্ষাপাত্র লইল—সুতরাং তাহার বিবাহ এবং রাজ্যাভিষেক হইতে পারিল না।

তারপরে সাত বৎসরের ‘রাহুল’ রাজবাটি ছাড়িয়া গেরুয়া পরিয়া মাথা মুড়াইয়া হস্তে ভিক্ষুপাত্র লইয়া সঙ্গে রহিল। তখন রাজা শুদ্ধোদনের মনে বড় ব্যথা লাগিল।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে আর রাজ্যের আকর্ষণে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। দ্বিতীয়পুত্র ‘নন্দ’ও অভিষেক নষ্ট করিয়া—বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পলাইয়া ভিক্ষু হইল। তারপর বংশের একমাত্র যে আশার স্থল ‘রাহুল’ সাত বৎসর বয়সে তাহাকেও কিনা তাহার পিতা ভিক্ষু করিতে লইয়া গেল। তবে আর তাঁহার বংশে রহিল কে? তিনি সঙ্ঘে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“পিতামাতার অনুমতি ভিন্ন তোমরা আর কোন বালককে সঙ্ঘে লইও না। এই আমার অনুরোধ।” পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বুদ্ধদেব সেই সময় হইতে সঙ্ঘ মধ্যে সেই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

তারপর অনেকদিন সেইখানে থাকিয়া শাক্যগণের মনে নবধর্মের বীজ দৃঢ়ভাবে রোপিত করিয়া বুদ্ধদেব আবার শিষ্যগণকে লইয়া ‘রাজগৃহ’ অভিমুখে গমন করিলেন।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধদেবের অমৃতময় সত্যধর্ম দেশ-দেশান্তর ছইয়া ফেলিল।

# চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

## সমাপ্তি

কপিলবাস্তু হইতে রাগগৃহে ফিরিবার পথে বুদ্ধদেব স্বীয় শ্বশুর বংশের লোকদের নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া রাজগৃহে বেণুবনে উপস্থিত হইলেন। এইখানেই তিনি বর্ষাকাল যাপন করেন, এইখানেই সুদন্ত নামক এক ধনবান বণিকপুত্র তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক হইলেন, এবং তাঁহার অগাধ ধনরাশি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের প্রতিপালনের জন্য তিনি উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজ বাড়ী শ্রাবস্তী নগরে বৌদ্ধগণের জন্য এক প্রকাণ্ড বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন। বৌদ্ধভিক্ষুগণের বাসস্থানের নাম বিহার। শ্রাবস্তীর এই বিহার ক্রমে বৌদ্ধগণের একটি প্রধান বিহারে পরিণত হইল এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব জীবনের অধিকাংশ সময় এই বিহারে আসিয়া বাস করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে অকাতরে দরিদ্রসেবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করাতে সুদন্তের নাম হইল ‘অনাথপিণ্ড’

বুদ্ধদেব প্রতি বর্ষাকালে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিহারে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, যখন তিনি যে বিহারে থাকিতেন সেই সময় তাহার নিকটস্থ লোকালয় হইতে বহুলোক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিতেন এবং দলে দলে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন, কিন্তু শ্রাবস্তীর জেতবনের অনাথপিণ্ড প্রদত্ত বিহার তাঁহার এত প্রিয় ছিল যে, সে বিহারে তিনি চারিবার বর্ষা যাপন করিয়াছিলেন।

একবার বর্ষায় তিনি বৈশালী নগরে মহাবনস্থ বিহারে বাস করিতে ছিলেন। বর্ষার প্রায় অর্দ্ধেক কাটিয়া গিয়াছে এমন সময় হঠাৎ খবর আসিল যে রাজা শুদ্ধোদন মৃত্যু শয্যায়। সংবাদ পাইয়া বুদ্ধদেব পিতৃদর্শনে যাইবেন স্থির করিলেন। তিনি শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া

কাল বিলম্ব না করিয়া পিতৃদর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। ৯৭ বৎসর বয়সে রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যু হয়। বুদ্ধদেব পিতৃ সৎকার কার্য সমাপন করিয়া শোকার্ভ সকলকে প্রবোধবচনে সান্ত্বনা দান করিলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় মহাবন বিহারে চলিয়া আসিলেন।

শুদ্ধোদনের মৃত্যুতে শাক্যবংশ প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কারণ রাজকুমারগণ ইতিপূর্বেই সকলে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন এই রাজ্যশাসন বা রাজৈশ্বর্য ভোগের বা ব্যবস্থার আর কেহই বাকী নাই। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে কেবল কতকগুলি রমণী ও শিশু সন্তান ভিন্ন অন্য কেহ রহিল না। একদা রমণীরাও রাজকীয় বেশভূষা ছাড়িয়া সন্ন্যাসিনী বেশে বুদ্ধদেবের বিহারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপুরী ও সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। তখনকার দিনে নারী সমাজ পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলিবৎ ছিল এবং গৃহাভ্যন্তরের কাজেই নিয়োজিত থাকিত। পুরুষের মত নারীদের কোন সামাজিক অধিকার ছিল না। কোন উচ্চ সামাজিক বা ধর্মকার্য্যেও নারীর অধিকার ছিল না। এই সামাজিক প্রথা ছিল অলঙ্ঘনীয়। রাজ পরিবারের নারীরা আজ সেই বিধি লঙ্ঘন করিয়া সন্ন্যাসিনী বেশ লইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। বুদ্ধদেব ধর্ম্মে ও সমাজে নারীর অধিকার এই প্রথম স্বীকার করিয়া লইলেন। তিনি এই রমণীগণকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নূতন ‘ভিক্ষুণী’ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মত এদের জন্যও ধর্ম্মের বিধিনিষেধের নির্দেশ প্রদান করিয়া গেলেন। গোপাকে তিনি ‘ভিক্ষুণী’ সম্প্রদায়ের কত্রী করিয়া গেলেন। গোপার অধীনে ভিক্ষুণী সম্প্রদায় দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইলেন। কিছুদিন পরে মগধের রাজা বিশ্বাসারের পাটরাণী ‘ক্ষেমা’ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। দেশদেশান্তরে এই খবর প্রচারে মহা-আলোড়ন সৃষ্টি হইল।

এদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম আপন সত্য গৌরবে দিন দিন যতই দেশদেশান্তরে

বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল ততই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ক্ষয় হইতে লাগিল। এই পরাজয়ের গ্লানি ব্রাহ্মণগণ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তাই বৌদ্ধ ধর্মকে সমূলে ধ্বংস করিবার প্রয়াসে তাহারা নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। যাহাতে বুদ্ধদেবের প্রতি সকলে ঘৃণা উপস্থিত হয়, যাহাতে আর কেহ বৌদ্ধ ধর্মের বাণী না শুনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নানা অপপ্রচারে সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে, যুক্তিতর্ক ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা বুদ্ধদেবকে পরাস্ত করা অসম্ভব। তাই তাঁহারা গোপনে অত্যন্ত কুৎসিত উপায়ে বুদ্ধদেবের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতে আরম্ভ করিলেন। সত্য ও ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণগণের এই চক্রান্তও ব্যর্থ হইয়া গেল।

বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের নবম বর্ষে, তাঁহার ধর্ম বহুদূর বিস্তৃত হইয়া দেশদেশান্তর ছাইয়া ফেলিল। ইনি ইতর, ভদ্র, ধনী, দরিদ্র সাধু-অসাধু, চরিত্রবান, পণ্ডিত, স্ত্রী ও পুরুষ কাহাকেও ঘৃণা না করিয়া সকলকে সমভাবে সত্যের অমৃত বিতরণ করিয়া যাইতেন। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংখ্যা অগণিত ভাবে বাড়িয়া চলিল।

কয়লার ময়লা যেমন ধুইলে যায় না তেমনি ধর্ম গ্রহণ করিলেও অনেক ক্ষেত্রেই লোকের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়া উঠে না, কতগুলি ত্রুর প্রকৃতির লোক ভিক্ষু হইয়াও সংগুণের অভাবের জন্য হৃদয় শোধন করিতে পারিল না। তাহারা সংঘের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য দলাদলি ও বিবাদের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইল। বুদ্ধদেব দেখিলেন তিনি জীবিত থাকাকালেই যখন বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি হইতেছে, তাঁহার অবর্তমানে বৌদ্ধ সংঘ গৃহ-বিবাদে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। তাই তিনি বিস্তর চেষ্টা এবং প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ভিক্ষু সম্প্রদায় হইতে আত্মকলহের বীজ উৎপাটন করিয়া দিলেন। আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্ম-অপরাধ বুদ্ধিতে পারিয়া সকলেই বিশেষ অনুতপ্ত হইয়া ভবিষ্যতের জন্য তাঁহারা সকলেই সাবধান হইলেন।

বুদ্ধদেব জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই ভাবে পরিশ্রম করিয়া ধর্ম্মের বাণী প্রদান করিতেছিলেন। তিনি জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়াই যেখানে যখন যাহা ভাগ্যে জুটিত তাহাই আহাৰ করিতেন, যদিও বিহারে এবং ভিক্ষুদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরামিষ আহাৰের বিধি রহিয়াছে।

এক বনে অঙ্গুলিমাল নামক এক ক্রুর প্রকৃতির ভয়ানক দস্যু বাস করিত। তাহার অত্যাচারের কোন সীমা ছিল না নররক্ত না দেখিলে তাহার প্রাণ শাস্তি পাইত না। এই অঙ্গুলিমাল কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে গ্রামে ও নগর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠরাজ করিত। তাহার ভয়ে দেশবাসী ভীত সন্ত্রস্ত থাকিত।

একদা বুদ্ধদেব তাহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই বনে প্রবেশ করিয়া অঙ্গুলিমালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লইলেন। কিছুদিন পর যখন লোকে দেখিল যে অঙ্গুলিমালও একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু—বিনয়নম্র ভাবে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দ্বারে দ্বারে নতমস্তকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, তখন লোকে বলিল—ধন্য প্রভু বুদ্ধদেব, ধন্য বৌদ্ধধর্ম্ম।

এইরূপে জীবের দুর্গতি হরণের জন্য সকলকে প্রেমের ডুরিতে বাঁধিবার জন্য, লোকের হৃদয় হইতে হিংসা ঘৃণা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিতে বুদ্ধদেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুর বেশে অকাতরে অমৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন। সেই অমৃত শ্রোতে পৃথিবী অভিষিক্ত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল।

ক্রমে তাঁহার বয়ঃক্রম আশী বৎসর অতিক্রম করিল। মৃত্যু কাল ক্রমশঃ নিকটে আসিল। তিনি বৈশালীর মহাবনে একদিন তাঁহার সমস্ত ভিক্ষু সম্প্রদায়কে সমবেত করিয়া তাঁহার শেষ উপদেশ প্রদান করিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার বাণী শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তিনি দৃঢ়তার সহিত তাঁহাদের সান্ত্বনা ও বল প্রদান করিলেন। এইখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে বৈশালীর নিকটবর্ত্তী ‘পাওয়া’

গ্রামে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব যখন যে গ্রামে যাইতেন তখন সেই গ্রামের অনেকে তাঁহার আহারের আয়োজন করিতেন। তিনি সকলের নিমন্ত্রণই রক্ষা করিতেন, কখন কাহাকেও নিরাশ করিয়া মনোকষ্ট দিতেন না। এই ‘পাওয়া’ গ্রামে ‘চণ্ড’ নামে এক তাস্কার বাস করিত। বুদ্ধদেবের আগমন সংবাদ পাইয়া সে সর্ব্বাগ্রে গিয়া তাঁহাকে তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণপূর্ব্বক যথাসময়ে চণ্ডের বাড়ীতে সশিষ্যে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধদেবের নিয়ম ছিল যে যাহা দিত তাহাই আহার করিতেন। তবে লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিত এবং নিরামিষই আহার করিতে দিত। কোন সময়ে কোথাও কেউ মাংস খাইতে তাঁহাকে দেয় নাই। কিন্তু অজ্ঞ তাস্কার চণ্ড এই সমস্ত বিধিনিষেধ না জানিয়া বুদ্ধদেব এবং তাঁহার শিষ্যদের আহারের জন্য অন্ন, পিষ্টক এবং শুষ্ক শূকরের মাংস পরিবেশন করিল। বুদ্ধদেব মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং পাছে চণ্ড কিছু মনে করে সেই জন্য প্রথমেই বলিলেন—“আমি মাংস খাইতেছি, কিন্তু আমার শিষ্যেরা কেহই মাংস খাইবে না, তাহাদিগকে মাংস দিও না।”

আহার শেষে ধর্ম্মবাণী প্রচার করিয়া বুদ্ধদেব চণ্ডের গৃহ ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যেই তাঁহার পেটের পীড়া উপস্থিত হইল। তিনি দারুণ আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন। অতি কষ্টে সেইখান হইতে কুশী নগরে মল্লরাজাদিগের শালবনে গমন করিলেন। এই শাল বনেই তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইল।

মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব তিনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, “দেখ,—কেহ এমন কথা বলিও না যে—চণ্ডের বাড়ীতে মাংস খাইয়া বুদ্ধদেব মারা গিয়াছেন। চণ্ড যেন এখনও এইরূপ কথা না শুনিতে পায়। কহিও, সুজাতার অন্ন আহার করিয়া আমি বুদ্ধ হইয়াছি এবং চণ্ডের দেওয়া মাংস আহার করিয়া আমি এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। ইহারা দুইজনই আমার পরম হিতৈষী বন্ধু এবং দুইজনই পুণ্যবান।”

এইভাবে বুদ্ধদেব সারা দিনরাত্রি শিষ্যদের নানাভাবে উপদেশ দিতে দিতে গভীর নিশীথে সেই শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করিলেন। যে উজ্জ্বল রবি দীর্ঘকাল ধরিয়া পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিলেন, তিনি আর নাই। ভারত গগনের উজ্জ্বল সূর্য্য অস্তমিত হইল—যুগ যুগ ধরিয়া দেশবাসী কেবল স্মরণ করিবে, বরণ করিবে এই মহাপুরুষকে, কিন্তু তাঁহাকে আর মানব-দেহধারীরূপে আপন ভাবে কাছে পাইবে না। নিয়তির এই পরিণাম সর্ব্বত্র বিরাজিত, এই ভাবিয়া সকলেই সান্ত্বনা লাভ করিবে।

### সমাপ্ত